দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ৩ আগস্ট, ২০২০।। ১৮ শ্রাবণ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

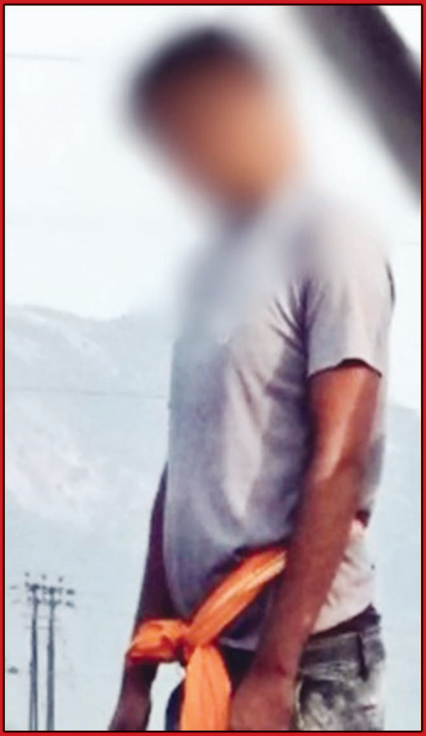

রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া

পশ্চিমবঙ্গে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৩ আগস্ট - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৩

কমিউনিস্ট কুৎসার হাত থেকে রেহাই নেই অমিতাভ বচ্চনেরও □ অভিমন্যু গুহ □ ৪

সংবিধানের শাসন বিপর্যস্ত হলে রাষ্ট্রপতির শাসনই শ্রেয় □ বিমল শংকর নন্দ □ ৬

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া অবাধ নির্বাচন প্রহসন মাত্র □ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৯

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয় □ ড. পঙ্কজ কুমার রায় □ ১২

আগ্রাসনের দিন শেষ, গালওয়ান পর্বে চীনকে বুঝিয়ে দিল ভারত □ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী □ ১৫

ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বে আরও তীব্র হয়েছে □ ড. মনমোহন বৈদ্য □ ১৭

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ কাজ □ ডা. শচীন্দ্রনাথ সিংহ □ ২০

এক করোনাজয়ীর আত্মকথা : করোনা এক অমানবিক মুখ □ জয়ন্ত পাল □ ২১

কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সরকার থাকার খেসারত রাজ্যবাসীকে দিতে হচ্ছে □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৩

জওহরলাল নেহরু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় □ ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় □ ২৫

বিদ্যাসাগরের আলোকে বর্ধমান □ ডা. বলরাম পাল □ ২৯

ভ্রাতৃত্বের প্রতীক রাখি □ ধীরেন দেবনাথ □ ৩১

নেপালি রামায়ণ □ ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৩

বীরভূমে শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ □ বিশ্বজিৎ মণ্ডল □ ৩৫

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যতীত অবাধ নির্বাচন সম্ভব নহে

বিধানসভা নির্বাচনের দিন যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই বিভিন্ন মহলে একটি সংশয় ঘনীভূত হইতেছে। তাহা হইল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরকারে রাখিয়া কোনোরকম স্বচ্ছ নির্বাচন এই রাজ্যে সম্ভব কিনা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল হইতে এইরকমও দাবি উঠিয়াছে, রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করিয়া এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন করা হউক। এই দাবির পক্ষে বলা হইতেছে, একমাত্র রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যতীত এই রাজ্যে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নহে। এইরকম ধারণার সঙ্গত কারণও রহিয়াছে বৈকি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বৎসরের ইতিহাস বলিতেছে, এই রাজ্যে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি সমূহকে সম্পূর্ণ পদদলিত করিয়া একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। সবরকম গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হইয়াছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে এই রাজ্যে যে কয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কোনো নির্বাচনকেই অবাধ এবং সুষ্ঠু আখ্যা কোনোমতেই দেওয়া যায় না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কীভাবে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল এবং কীভাবেই বা হিংসার বিনিময়ে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েতগুলির দখল লইয়াছিল, তাহা সকলের জানা। গত নয় বৎসরে বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচনে এবং বিগত বিধানসভা নির্বাচনেও শাসকদলের সন্ত্রাস রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কঠোর ভূমিকা শাসক দলের অবাধ সন্ত্রাসের পক্ষে কিছুটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে, বহু কেন্দ্রে রাজ্যের মানুষ অবাধে ভোট দিয়া ১৮টি আসনে বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের জয়যুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু শুধু নির্বাচনের সময়ই যে শাসক দল সন্ত্রাস করে বিষয়টি এমনও নহে। সংবৎসর শাসক দল সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমস্ত রকম প্রতিবাদকে দমন করিতে চাহে। রাজ্যে বিরোধী দলের কর্মীদের উপর নানাভাবে নির্যাতন হইতেছে। পুলিশ লেলাইয়া দিয়া মিথ্যা মামলায় তাহাদের হয়রান করা ছাড়াও, গত নয় বৎসরে বহু বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হইয়াছে। এবং নির্বাচন যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই এই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং সেইভাবে রাজ্যে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে স্বয়ং রাজ্যপাল শঙ্কিত বোধ করিতেছেন। এমতাবস্থায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে ক্ষমতায় রাখিয়া কোনোমতেই সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন সম্ভব নহে—তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ও রাষ্ট্রপতির শাসনে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দাবি তুলিয়াছেন।

ইতিমধ্যে একটি সম্ভাবনা অবশ্য দেখা যাইতেছে। একটি সূত্রের সংবাদ, করোনা পরিস্থিতিজনিত কারণে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন পিছাইয়া আগামী বৎসর নভেম্বর মাস নাগাদ হইতে পারে। সেক্ষেত্রে, ২০২১-এর ২৭ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মেয়াদ হইয়া যাইবে। এবং স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রপতির শাসনেই আগামী বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এখন জল কতদূর এবং কোথায় গড়ায় সেইটাই দেখিবার অপেক্ষা।

সুভাষিতম্

তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যং যাবৎ ভয়ং ন আগতম্।

আগতং হি ভয়ং বীক্ষ্য প্রহর্তব্যং অশংকয়া।। (পঞ্চতন্ত্র)

ভয় যতক্ষণ উপস্থিত হয়নি ততক্ষণই ভীত থাকা উচিত। এসে যাওয়া ভয়কে দেখে বিনা শঙ্কায় প্রহার করতে হবে।

উত্তর সম্পাদকীয়

কমিউনিস্ট কুৎসার হাত থেকে রেহাই নেই অমিতাভ বচ্চনেরও

অভিমন্যু গুহ

প্রথমে একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে শুরু করি। অমিতাভ বচ্চন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর এক শ্রেণীর মানুষের উল্লসিত অভিব্যক্তি দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যার প্রধানতম একটা নমুনা হলো প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে জীবনপণ বাজি রেখে যাঁরা লড়ছিলেন, বিশেষ করে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী , তাঁদের মনোবল বাড়াতে ও সার্বিকভাবে করোনার বিরুদ্ধে 'ঐক্যবদ্ধ ভারতে'র বার্তা দিতে কাঁসর বাজিয়েছিলেন বলিউডের ওই প্রবীণ ও জনপ্রিয় অভিনেতা। এতে করে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার দরুন তাঁর দিকে ছুটে এল কটাক্ষের নিদারুণ সব বাণ। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট যে, এত কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে কী লাভ হলো? পরবর্তী বক্তব্যে আসার আগে এই বিষয়টা স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

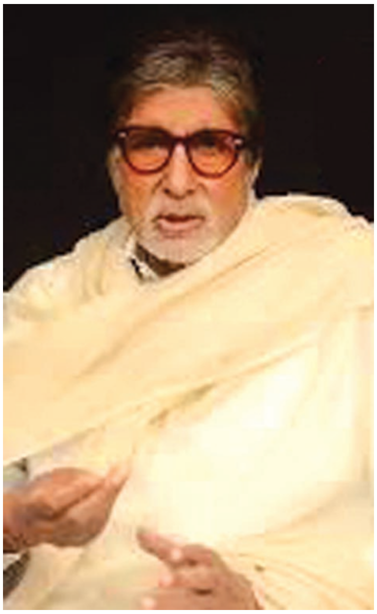

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকে করোনার বিরুদ্ধে 'ঐক্যবদ্ধ ভারতে'র বার্তা পৌঁছে দিতেই কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোর কৌশল নিয়েছিলেন, আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। হরেককিসিমের বামপন্থীরা প্রত্যেকেই তাতে 'হিন্দুত্বে'র গন্ধ পেয়েছিলেন, কারণ কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোর প্রথা নাকি কেবলমাত্র দেব-দেবীর পুজোতেই দেখা যায়। কোনও সন্দেহ নেই কমিউনিস্টদের, বিশেষ করে ভারতীয় কমিউনিস্টদের একটি প্রবল সিম্পটম হলো হিন্দুত্বফোবিয়ায় ভোগা, সেই কারণে সব বিষয়ে হিন্দুত্বের ভূত তাঁরা দেখে থাকেন। আরও একটা বিষয়, দেশভাগজনিত দাঙ্গার সময় মুসলমানরা যখন আজান বাজিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হামলার সাংকেতিক নিদান দিত, তখন অনেক জায়গায় হিন্দুরা কাঁসর বাজিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিত। যার ফলে ৪৬-৪৭-এর দাঙ্গায় যত হিন্দু প্রাণ হারিয়েছেন, সেদিন প্রতিরক্ষার এই ব্যবস্থাটুকু না নিলে দাঙ্গায় নিহত হিন্দুর প্রকৃত সংখ্যাটা আরও কতটা হতে পারত তা ভাবলেও ভয় করে। এই 'আরও' হিন্দুকে কচুকাটা না করতে পারার দুঃখ মুসলমানদের থেকেও বোধহয় হিন্দুনামধারী কমিউনিস্টদের প্রাণে আরও বেশি বেজেছিল এবং আজও বাজে। যে কারণে সেদিন হিন্দুদের প্রতিরক্ষার এই পদ্ধতিকেও তারা সম্পূর্ণ ভুল ও অপব্যাখ্যা করে, প্রধানমন্ত্রীর কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোর আহ্বানের সঙ্গে এক করে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিলিয়ে দিতে তাদের বাধেনি এবং এর মাধ্যমে দাঙ্গা লাগানোর মরিয়া চেষ্টা তারা করেছিল। কয়েকমাস আগে ঘটে যাওয়া কাঁসর-ঘণ্টার এহেন বিতর্ক এবং সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চনের করোনায় আক্রান্তের ঘটনায় তাকে আবার টেনে আনাকে পাশাপাশি রাখলে দুয়ে দুয়ে চার করতে কোনও সমস্যা হবে না।

অমিতাভ বচ্চন যতদূর জানি তিনি কংগ্রেসি ঘরানার লোক, একবার ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যা জনিত কংগ্রেসের পক্ষে প্রবল সহানুভূতি ভোট ও নিজস্ব ক্যারিশমাকে কাজে লাগিয়ে রেকর্ড ভোটে তিনি জেতেন এলাহাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী জয়া বচ্চন সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার চারবারের সাংসদ। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে বচ্চন-পরিবার বিজেপি মতাদর্শের বিরোধী। তবুও দেশের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন অমিতাভ বচ্চন মনে করেছিলেন। কারণ নরেন্দ্র মোদী কোনও একটি দলের প্রধানমন্ত্রী নন বা ভারতীয় গণতন্ত্রে কোনও বিশেষ দলের প্রতিনিধিত্ব তিনি করছেন না; তিনি বিশ্বের দরবার সমগ্র দেশের তরফ থেকে প্রতিনিধি--- এই সহজ-সরল তথ্যটা বচ্চনসাহেব বুঝতে পারলেও বামপন্থীরা অবুঝ। কেন অবুঝ, মতাদর্শের তাগিদে নাকি বিদেশি রাষ্ট্রের দালালির কারণে নাকি পেট্রোডলারে পুষ্ট হওয়ার জন্য, এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তরে যাচ্ছি না; সময়ে ধর্মের কল ঠিক বাতাসে নড়বে। কিন্তু দেশ-বিরোধিতা আর বিজেপির প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা এক নয় বলে বাম্পন্থীদের তরফ থেকে মাঝেমধ্যে যে ঢক্কানিনাদ ওঠে সেটা আসলে তাদের নগ্ন দেশদ্রোহী রূপটা আড়াল করবার জন্য।

আমরাও সহমত যে দেশ-বিরোধিতা ও বিজেপি বিরোধিতা দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু যখন কেউ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তখন তিনি আর বিশেষ দলের থাকেন না, তিনি সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রের কাছে তিনি দায়বদ্ধ। তাঁর নীতির সমালোচনার অধিকার সবার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' প্রবাদবাক্য মেনে তাঁর বিরোধিতা করাটাই হবে একমাত্র লক্ষ্য, তাতে

দেশের স্বার্থ চুলোর দোরে যায় তো যাক। বহুবার বলেছি, আবারও বলি এই প্রবণতা নতুন নয়। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিয়ে 'মতাদর্শগত' আখ্যা দিয়ে বহু ঝড়, বহু ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেছে, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করেছে এগুলো আসলে বৈদেশিক কমিউনিস্ট-তকমাধারী দেশের দালালি করতে, কখনও-বা স্রেফ ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আরও একটা বড়ো কারণ ছিল, সেটা হলো হিন্দু-ফোবিয়া। হিন্দু-ফোবিক কমিউনিস্টদের এখন মূল টার্গেট যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেটা আগের সংখ্যাতেই লিখেছি, তাতে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে কীভাবে হিন্দুফোবিয়া থেকে তারা বাঙ্গালি হিন্দুর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কদর্য প্রচার চালিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভারত-কেশরীর অপরাধ তিনি ইসলামিক স্বাধীন বাংলাদেশ করতে না দিয়ে একক কৃতিত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ছক বানচাল করে দিয়েছিলেন। তাতে ব্রিটিশ প্রভুদের যত না গায়ে গেলেছিল তাদের ভৃত্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বুকে তা বেজেছিল শতগুণ। সেই একই হিন্দু-ফোবিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিগৃহীত করছে। গোধরায় করসেবকদের নারকীয় হত্যা হিন্দুফোবিক কমিউনিস্টদের যার পর নাই আহ্লাদিত করেছিল। কিন্তু গোধরা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় তারা বুঝেছিল এ ভীষণ কঠিন ঠাঁই। তাদের স্বাভাবিক মিত্র সোনিয়া গান্ধীর 'মওত কা সওদাগর' একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে, এ তাদের দুঃস্বপ্নেও ঠাঁই পায়নি। তাই যখন চিন্তাভাবনায় বিজেপির বিপরীত ঘরানার মানুষ হয়েও দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কেউ প্রয়োজন মনে করেন তিনি যে কমিউনিস্টদের সফট টার্গেটে পরিণত হবেন সে তো বলাই বাহুল্য।

কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোর ঘটনাটা তো একটা সামান্য উদাহরণ মাত্র। ভারতের জাতীয় পশু বাঘ, জাতীয় পাখি ময়ূর দেখানোর পাশাপাশি অমিতাভ বচ্চনকে দেশের জাতীয় কোভিড পেশেন্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে। একে নিছক ফেসবুকীয় মিম বা রসিকতা ভাবলে খুব ভুল হবে। এই 'মিম'গুলির জন্মদাতারা জাতে আসলে কমিউনিস্ট। এই মিমগুলির লক্ষ্য প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে হয়তো অমিতাভ বচ্চনকেই, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সেই নরেন্দ্র মোদী, হিন্দু-ফোবিয়া থেকে যার প্রতি কমিউনিস্ট বিদ্বেষের জন্ম। যিনি এই করোনাকালে বারবার কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন, তাদের নোংরামির শিকার হয়েছেন। এই কমিউনিস্টদের পিতৃভূমি থেকে 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপন' হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবে এই মারণরোগ বিশ্বে ছড়াল। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু নিজেদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বে এই মারণ রোগ যাতে প্রতিরোধ করা যায় তার জন্য তৎপর হলো। তার মধ্যে কমিউনিস্টদের পিতৃভূমি আবার তাদের জারিজুরি বিশ্বের দরবারে ফাঁস হচ্ছে দেখে তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতিবশত গালোয়ানে ভারতের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া আরম্ভ করল। তখন দেশবাসীর করের টাকা ধ্বংস হচ্ছে বলে কমিউনিস্টরা দেশ বিরোধিতার নয়া নজির গড়ল। আপনি প্রতিবাদী হলে আপনাকে 'চাড্ডী', 'সঙ্ঘী', চাঁই কী 'ভক্ত' বলে দেগে দেবে। অমিতাভ বচ্চন 'সেলিব্রিটি' বলে তাঁরটা নজরে পড়েছে। এমন কত লক্ষ লক্ষ নন-সেলিব্রিটি রয়েছে সেগুলো নজরেও আসে না। কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদীকে একইভাবে উপলক্ষ্য করে প্রাক্তন ক্রিকেট-অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পেছনে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেগেছিল কমিউনিস্টরা। 'বাঙ্গালি' বলে তাঁকেও কমিউনিস্ট মতাবলম্বী 'পক্ষবাদী'রা রেয়াত করেনি। অমিতাভ বচ্চনের পক্ষে ওকালতি করাটা 'স্বস্তিকা'র উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সাম্প্রাতিক কমিউনিস্ট দেশ-বিরোধী ট্রেন্ড বোঝাতে আমরা এই উদাহরণ টানতে বাধ্য হলাম।

সম্প্রতি জনৈক ব্যক্তি অমিতাভ বচ্চনের করোনায় মৃত্যু কামনা করেছেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা মতাদর্শগত ভাবে কমিউনিস্ট কি না জানা নেই। সম্ভবত নয়। কিন্তু কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিষবাষ্পটা তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। যেটা সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় গণতন্ত্রকে কলুষিত করেছে। বিষয়টা বুঝিয়ে বলি, মানুষের অসুস্থতার সময়ে তার মৃত্যু কামনার নোংরামি কমিউনিস্ট সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভব। পরিস্থিতির সুযোগ সন্ধানী কমিউনিস্টরা গত বছর এক প্রবীণ রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর পর, শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ে বিজেপি হবার কারণে নগ্ন উল্লাসে মেতেছিল। ভারতের পূর্বতন প্রধান মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রয়াত হবার পর 'মানুষ মারা গেলেই মহান হয়ে যায় না' এই যুক্তি সাজিয়ে তাঁর মৃত্যুর দিনেই তাঁকে আক্রমণ করেছিল কমিউনিস্টরা।

অমিতাভ বচ্চন যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তা অসহিষ্ণুতার পরিচয় সন্দেহ নেই। আমরা অমিতাভ বচ্চনের পক্ষে ওকালতিও করছি না। সে করার দায়ও নেই। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে এই মুহূর্তে মুখোশধারীদের চিনিয়ে দেওয়ার দরকার আছে। তাঁর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আগমার্কা ছোটো-মেজো-বড়ো সব সাইজের বিপ্লবীরা মাঠে নেমে পড়েছেন অমিতাভ কতটা নীচ, কতটা অসংবেদনশীল তা বোঝাতে। কিন্তু বিপ্লবীরা এটা বুঝতে পারছে যে, অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু কামনা কোনো সুস্থ রুচির পর্যায়ে পড়ে না। অ্যারিস্টটল একটা কথা বলেছিলেন —'মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে রাজনৈতিক জীব'। এদেশের কমিউনিস্টরা এই তত্ত্বকেই ব্যবহারিক ভাবে কাজে লাগিয়েছে। আমাদের এই ফাঁদটাকে বোঝা দরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করার মুখোশের আড়ালে এদের দেশদ্রোহিতার যে বীজ লুকিয়ে আছে সেটা এখনো না বুঝলে এরা দেশের আরও বড়ো ক্ষতি করে দেবে। ভারতবর্ষের মানুষের যে সাংস্কৃতিক মনন তাকে রাজনৈতিক করে না তুলতে পারলে কমিউনিস্টরা জানে তাদের কার্যসিদ্ধির আশা নেই। সেই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা তাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টারই অঙ্গ, এটা বোঝা দরকার।

মনে রাখতে হবে, ১৯৬২-র মতো এখন কমিউনিস্টরা একটি বা দুটি সংগঠিত কমিউনিস্ট-নামধারী গোষ্ঠীতে বিভক্ত নয়। রাজনৈতিক ধান্দায় ও দেশদ্রোহীমূলক সুবিধালিপ্সায় একাধিক রাজনৈতিক ও আপাত-অরাজনৈতিক দলে তারা মুখোশের আড়ালে মিশে রয়েছে। অর্থাৎ তাদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটা আর আগের মতো সরল নয়। সুতরাং এই লড়াই জাতীয়তাবাদীদের জন্য কঠিনতর চ্যালেঞ্জ কোনও সন্দেহ নেই। কারণ লড়াইটা দলগত সেইসঙ্গে মতাদর্শেরও, যে মতাদর্শ দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব এমনকী জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও বিপজ্জনক। ■

সংবিধানের শাসন বিপর্যস্ত হলে রাষ্ট্রপতির শাসনই শ্রেয়

বিমল শংকর নন্দ

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কারণ ইতিহাস কোনো সরলরেখা ধরে চলে না। বিভিন্ন সামাজিক শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সামাজিক প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চারিত হয়। আর কখনো কখনো পুরোনো ঘটনা আবার নতুন করে ঘটতে থাকে। তখনই প্রয়োজন হয় নতুন ইতিহাস সৃষ্টির। আজ পশ্চিমবঙ্গ সেই নতুন ইতিহাস সৃষ্টির যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনে এরাজ্যে মুক্ত সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের অভিযোগ বার বার উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে শাসকদল কর্তৃক এ রাজ্যে গণতন্ত্রের পরিসরকে সংকুচিত করার, মানুষের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করার। যে প্রধান নীতিগুলির উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে তার সবগুলিকেই বিপর্যস্ত করার অভিযোগ উঠেছিল বাম শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তৎকালীন বাম শাসকদলগুলো বিশেষত সিপিএম-এর আগ্রাসী রাজনীতিকে দমন করতে বিরোধী দলগুলো বার বার এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছে। কেন্দ্রের কাছে দাবি করা হয়েছে এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির। ২০০৬ সাল থেকে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তার চরম পরিণতি ঘটে ২০১১ সালে বাম সরকারকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে। যে প্রধান বিরোধী দল এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের মূল দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রাজ্যবাসীর প্রতি তাদের আশ্বাস ছিল তারা যদি বাম সরকারকে উৎখাত করতে পারে তবে এ রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরে আসবে, এক মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল নতুন করে। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগগুলো উঠছে যা উঠতো পূর্বতন বাম সরকারের বিরুদ্ধে। বিরোধী দলকে তার প্রাপ্য পরিসর না দেওয়া, প্রশাসনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ, নির্বাচনে মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না দেওয়া— বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তৃণমূলর কংগ্রেসের শাসনকাল ৯ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবার নতুন করে দাবি উঠছে এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি না করলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। সংবিধানস্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার যা একটি মুক্ত সমাজে জনগণের ভোগ করার কথা তাও রক্ষা করা সম্ভব নয়। ক্রমেই জোরদার হচ্ছে এই দাবি।

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতীয় সংবিধানের রচনাকারগণ ভারতীয় গণপরিষদ এদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গণতন্ত্রের সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে দেশের ঐক্য ও সংস্কৃতি। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং ঐক্য ও সংহতির চেয়ে রাজ্যগুলির স্বাধিকার বড়ো হতে পারে না। কারণ একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক দেশের কাঠামোর মধ্যেই রাজ্যগুলি তাদের স্বাধিকার ভোগ করতে পারে। এবং দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো তখনই রক্ষিত হবে যখন দেশের সর্বত্র সংবিধানের ধারাগুলি কার্যকরী

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের গুন্ডামি।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের ওপর রাজ্যের শাসক দলের গুন্ডাদের আক্রমণ।

থাকবে। এ কারণেই ভারতীয় সংবিধানে ৩৫৬ নম্বর ধারাটিকে যুক্ত করা হয়। এই ধারা অনুযায়ী "কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে সেই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না বা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারি করতে পারেন।" সাধারণভাবে একেই রাষ্ট্রপতির শাসন বলা হয়। কারণ রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রশাসনিক যাবতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি নিজে পালন করতে পারেন কিংবা রাজ্যপাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে দিতে পারেন। আবার ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ না মানলে বা মানতে ব্যর্থ বা অক্ষম হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারি করতে পারেন। তবে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারির ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারাটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্বাধীনোত্তর ভারতে মূলত এই ধারারই প্রয়োগ ঘটেছে।

ভারতীয় সংবিধানে অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির যে সংস্থান আছে তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট। সংবিধান প্রণেতাগণ দেশে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। ফলে কোনো রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা যদি সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত না হয় তবে সেই রাজ্যের মন্ত্রীসভার হাত থেকে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ রাজ্যমন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয়। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের প্রশাসন পরিচালিত না হলে সেই রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। এ কারণে গণপরিষদের বিতর্কে অল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, ঠাকুরদাস ভার্গব কিংবা ব্রজেশ্বর প্রসাদের মতো ড.বি.আর আম্বেদকরও সংবিধানে এই ধারার অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে সংবিধানকে রক্ষা করতে গেলে কেন্দ্রের হাতে এই ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখা প্রয়োজন।

মানুষের গণতান্ত্রিক আধিকার নষ্ট হয় যদি সে সংবিধানপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করতে না পারে। বাম আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসার প্রয়োগ এতো বেশি যে এ রাজ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিংসার অভিযোগ ওঠে শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদের দিকে। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর ২০১১ সালে বামদলগুলি ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বিদায় নিলেও হিংসার পরিবেশ এ রাজ্যে কমে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এবং রাজনৈতিক হিংসা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে ১৬ জন রাজনৈতিক কর্মী নির্বাচন সম্পর্কিত হিংসায় নিহত হন। এর মধ্যে সাতজন নিহত হন পশ্চিমবঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের গুণ্ডামি।

আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি ঘাটাল লোকসভার মহিলা প্রার্থী ভারতী ঘোষও।

২০১৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ২০০৮ জন রাজনৈতিক কর্মী জখম হন হিংসার কারণে। এর মধ্যে ১২৯৮ জনই পশ্চিমবঙ্গে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ থেকে ২০১৬-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বছরে গড়ে ২০টি রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচন্যক কেন্দ্র করে এ রাজ্যে হিংসার সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে যায়। এই নির্বাচনে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে মোট ৫৮৭৯২টি আসনের এক তৃতীয়াংশের বেশি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে নেয় শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। সেই নির্বাচনে লাগামছাড়া হিংসার সাক্ষী হয় পশ্চিমবঙ্গ। বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে না দেওয়া, প্রচার করতে না দেওয়া, নির্বাচনের দিন হিংসা, এমনকী ভোট গণনার দিনও ভুরি ভুরি হিংসা এবং অসৎ উপায় অবলম্বন করে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমন কিছু রাজনৈতিক হিংসা এবং হত্যার ঘটনা ঘটেছে যা মানুষের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। হিংসা ঘটেছে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়কালে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে হিংসার এই প্রকোপ দেখে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত জুন মাসের এক ভার্চুয়াল র‍্যালিতে এ রাজ্যে ‘হিংসার সংস্কৃতি’ চালিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যের শাসকদলের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে হিংসার প্রকোপ অত্যন্ত বেশি, কারণ শাসকগোষ্ঠী এখানে বিরোধী দলগুলিতে জায়গা ছাড়তে চায় না। হিংসার সঙ্গে দুর্নীতির একটা প্রত্যক্ষ যোগ আছে, কারণ শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা কিংবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ‘দাতা-গ্রহীতা’-র সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তারা সেই সম্পর্কটিকে বদলাতে চায় না। অর্থাৎ তাঁরা দাতার ভূমিকায় থেকে যেতে চায় সে সম্পর্ক থেকে বৈষয়িক সুবিধা লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এ রাজ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষরা এতো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে আমফানের মতো ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণেও অজস্র দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতির পাশাপাশি রাজ্যের জনপ্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিশেষত পুলিশ প্রশাসনের। অসহায় মানুষ সঠিক পথ হাতড়াচ্ছে। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপালও বার বার রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

ভারতের সংবিধান দেশের সকল মানুষের জন্য মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাজ হলো সংবিধান অনুযায়ী প্রসাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা। সেই কাজে কোনো সরকার ব্যর্থ হলে সংবিধান স্বীকৃত পথে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠবে। পশ্চিমবঙ্গে সেই দাবিই উঠছে। কোনো ব্যক্তি বা দলের চেয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা অনেক জরুরি। তাতে যদি রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে হয় তাতেও অসুবিধা নেই।

(লেখক অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান, চারুচন্দ্র কলেজ, কলকাতা)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া অবাধ নির্বাচন প্রহসন মাত্র

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যেখানেই কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, মানবাধিকারকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। প্রকৃত ফ্যাসিবাদী হলো এই কমিউনিস্ট দেশগুলোই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও যেখানেই কমিউনিস্টরা প্রবেশ করেছে সেই জায়গাটাকেই বিষিয়ে দিয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে মাত্র তিনটি রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা হয়— কেরল, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ। এই তিনটি রাজ্যেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এইগুলিতে একটি বড়ো সময় ধরে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে বা এখনও করছে (কেরলের ক্ষেত্রে)। কারণ এটাই কমিউনিস্ট 'সংস্কৃতি'। পৃথিবীর যে দেশেই কমিউনিস্টরা রয়েছে সেখানেই এক দলীয় শাসনব্যবস্থা, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণুতাই কমিউনিস্ট নীতি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস কমিউনিস্ট 'আদর্শে' নেই। এই কারণেই ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল এই কমিউনিস্টদের কঠোর হাতে দমন করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ কমিউনিস্ট দলগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু নেহরু বাধা হয়ে দাঁড়ান। কাশ্মীর সমস্যা, চীন সমস্যার মতো ভারতবর্ষে এই কমিউনিস্ট সমস্যারও জনক হলেন নেহরু।

সিপিএমের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি টানা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ লক্ষ্য করেছেন ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করে কীভাবে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা যায়। বিরোধী রাজনৈতিক দল করলেই জমির ফসল কেটে নিয়ে চলে যাওয়া, পুকুরের জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া, পরিবারের মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া, বাড়িতে সাদা থান পাঠানো, চাকরি বা ব্যবসা করলে কর্মক্ষেত্রে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি করা ইত্যাদি চলত। এছাড়া মারধর করা, খুন করা ইত্যাদি তো চলতই। হাজার হাজার মানুষকে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ না মানার জন্য হত্যা করা হয়েছে সিপিএম শাসনে। নানুর, ছোটো আঙারিয়া, সাঁইবাড়ি, নন্দীগ্রাম, নেতাই-সহ অসংখ্য রাজনৈতিক গণহত্যা হয়েছে। নির্বাচনের সময় শুরু হতো আরেক প্রহসন। নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকে প্ল্যান করে তালিকা তৈরি করে বিভিন্ন অঞ্চলের বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক-নেতাকে হত্যা করা হতো। গ্রামে গ্রামে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের হুমকি দেওয়া হতো ভোট দিতে না যাওয়ার জন্য। ভোটার তালিকায় বহু বিরোধী ভোটারের নাম কাটা পড়ত। অনেক ভুয়ে ভোটার ঢোকানো হতো। এছাড়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বহু বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে তাদের

আক্রমণকারীদের হাত থেকে রেহাই নেই মহিলাদেরও।

নিহত তাপস বর্মন

রক্তাক্ত দাড়িভিট

নিহত রাজেশ সরকার

রেশন কার্ড ইত্যাদি করে দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলা তো ছিলই। এরপর ভোটের দিন বিরোধী দলের এজেন্টকে বুথ থেকে প্রথমে হুমকি দিয়ে, তাতে কাজ না হলে মেরে বের করে দেওয়া হতো। কিছুক্ষণ ভোট চলার পর শুরু হতো দেদার ছাপ্পা। বিরোধী দল কোথাও প্রতিরোধ করলেই চলত মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা, গুলি।

২০১১ সালে পরিবর্তনের পর রাজ্যের মানুষ আশা করেছিলেন যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল রাজ্যে ‘পরিবর্তনে’র সরকারের বদলে সত্যিই ‘উন্নততর বামফ্রন্ট’ সরকার স্থাপিত হয়েছে। এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারেন রাজ্যের আপামর জনতা ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে। দেশের অন্যান্য রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হলে একটা মশা পর্যন্ত মারা যায় না, কিন্তু এ রাজ্যে ১০০-র ওপর মায়ের কোল খালি হয়ে গেল পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়াতে। ১৪ মে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে (অবশ্য মাত্র ৬৬ শতাংশ পঞ্চায়েত আসনে, বাকি ৩৪ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকদল পূর্বেই পকেটস্থ করেছিল) এক দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া শুধুমাত্র রাজ্যপুলিশ ও সিভিক পুলিশ দিয়ে ভোট সম্পন্ন হলো। শুধু ওই দিনই ভোট হিংসায় রাজ্যে ২০-র বেশি মানুষ মারা যান। এমনকী যা পূর্বে সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি, তাও ঘটে। প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে ভোট পরিচালনা করতে গিয়ে উত্তর দিনাজপুরের স্কুল শিক্ষক রাজকুমার রায়ের মৃত্যু হলো। ভোটের পরের দিন ভোটগ্রহণকেন্দ্র থেকে বেশ দূরে রায়গঞ্জ স্টেশনের কাছে তাঁর খণ্ডবিখণ্ড দেহ পাওয়া গেল। রাজ্য সরকার এটাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও অনেকেই তা মানতে নারাজ। এছাড়া বিরোধীদের অভিযোগ ভোট গ্রহণের দিন অধিকাংশ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা অবাধে ছাপ্পা দিয়েছে। যার বহু চাক্ষুষ প্রমাণ সারদিন ধরেই টেলিভিশনের পর্দায় পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনগণ প্রত্যক্ষ করেছেন।

১৭ মে ছিল ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিন। এদিনটাও ছাপ্পামুক্ত হলো না। টিভির পর্দায় নদিয়ার মাজদিয়া কলেজের ভোট গণনকেন্দ্রে শাসকদলের এক নেতাকে দেখা গেল ছাপ্পা দিতে। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমাদের মাথা আরেকবার বাকি ভারতবর্ষের

কাছে লজ্জায় নত হয়ে গেল। বিরোধীদের অভিযোগ বহু জায়গায় তাদের কাউন্টিং এজেন্টদের মেরে বের করে দেওয়া হয় গণনায় কারচুপি করার জন্য। ২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সবদিক দিয়েই ছিল অনন্য। শুধু এখানে ত্রিস্তর মানেটা একটু আলাদা। প্রথম স্তরে রাজ্যের সমস্ত বিডিও, এসডিও এবং ডিএম অফিসের সামনে 'উন্নয়ন' (পড়ুন শাসকদলের সশস্ত্র দুষ্কৃতীবাহিনী)-কে দাঁড় করিয়ে রেখে বিরোধীদের মনোনয়ন তুলতে ও জমা দিতে বাধা দেওয়া, দ্বিতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া শুধুমাত্র রাজ্য পুলিশ ও সিভিক পুলিশ দিয়ে ভোট করিয়ে নির্বাচনের দিন অবাধ ছাপ্পা ও সন্ত্রাস এবং তৃতীয় স্তরে ভোট গণনার দিন গণনায় ব্যাপক কারচুপি। বামফ্রন্ট আমলেও সন্ত্রাস, বহু মানুষের মৃত্যু, ছাপ্পা সবই হতো, কিন্তু ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো নির্বাচনকে সম্পূর্ণ প্রহসন বানাতে তারাও কখনো পারেনি তাদের ৩৪ বছরের শাসনকালে।

রাজ্যের ৮২৫টি জেলা পরিষদের মধ্যে ভোট হয়েছিল ৬২২টিতে। অর্থা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল ২৪ শতাংশ জেলা পরিষদ আসন দখল করেছিল। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে বিজেপি বেশ কিছু জায়গায় ভালো ফল করলেও জেলা পরিষদে সর্বত্রই তৃণমূলের জয়জয়কার হয়। এর কারণ জেলা পরিষদ আসনের ভোট গণনাতে ব্যাপক কারচুপি হয়েছিল। অধিকাংশ জেলা পরিষদ আসনেরই ভোট গণনা হয়েছিল গভীর রাত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির গণনার পর। বহু জায়গায় বিরোধী কাউন্টিং এজেন্টদের মেরে বের করে দেওয়া হয় রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। উত্তরবঙ্গে শাসকদলের এক বুদ্ধিজীবী তদানীন্তন সাংসদ সারা রাত ধরে ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও গণনাকেন্দ্রের ভেতরে কারচুপিতে নেতৃত্ব দেন জেলা পরিষদ আসনে ভোট গণনার সময়। এগুলিই মোটামুটিভাবে জেলা পরিষদ স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বগ্রাসী সাফল্যের কারণ।

এ রাজ্যে বিগত বছরগুলোতে বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচন ৫-৬ দফা ধরে হয়ে আসছে, যা ভারতবর্ষের আর কোনো রাজ্যে হয় না। একটা সময় ছিল যখন বিহারে নির্বাচনের সময় গণ্ডগোল হতো। কিন্তু বর্তমানে বিহারও সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে অবাধ নির্বাচন না হওয়া শুধু বাঙ্গালিদের পক্ষেই একটা বড়ো লজ্জার কারণ তাই নয়, ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষেও একটি বড়ো বিপদ। বিগত দু' বছরে ভারতীয় জনতা পার্টির একশোর বেশি নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকী কিছুদিন আগে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের এক বিজেপি বিধায়ককে হত্যা করে সেটাকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলেছে। যে রাজ্যে একগজন বিধায়ককেই এইভাবে খুন করা হতে পারে সেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির গ্রামাঞ্চলের কর্মী-সমর্থকদের কী অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গের একটি থানার আইসি আটক বিজেপি সমর্থকদের মাংস-ভাত খাইয়েছিলেন এই 'অপরাধে' তাঁকে তৎক্ষণাৎ বদলি করা হয়। সিপিএমের আমলে প্রশাসন ব্যবস্থার যে রাজনীতিকরণ শুরু হয়েছিল এ রাজ্যে তাই বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের সচিব ,সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে জেলাশসক, পুলিশ সুপার থেকে থানার ওসিদের সঙ্গে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের কোনো অমিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় নেতা-মন্ত্রীরা পর্যন্ত অনেক সময় সভা করতে পারেননি পশ্চিমবঙ্গে। কখনো তাদের হেলিকপ্টার নামবার অনুমতি দেওয়া হয়নি আবার কখনো বা তাদের সভাস্থলের অনুমতি মেলেনি। শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে পুলিশ এই কাজগুলি করেছিল। লোকসভার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও অনেকক্ষেত্রেই তাদের কোনো কাজ না দিয়ে বসিয়ে রাখা হয় বা উত্তেজনাপূর্ণ বুথগুলি বাদ দিয়ে তুলনামূলকভাবে শান্ত এলাকার বুথগুলিতে দায়িত্বে পাঠনো হয়। ২০১৯ থেকে রাজ্যে কোনো পুরনির্বাচন হয়নি। কারণ এগুলিতে ঠিক সময়ে ভোট হলে অধিকাংশতেই শাসকদলের হেরে যাবার ভয় ছিল। এই পৌরসভাগুলিতে এখন কমিশনার বসানো রয়েছে। এমনকী গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোনো সরকারি আধিকারিক নন, বরং পৌরসভাগুলিতে পূর্বতন শাসকদলের চেয়ারম্যানকেই কমিশনার পদে বসানো হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে, এই রাজ্যে রাজ্য সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই। কারণ এ রাজ্যে প্রশাসন ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করা যায়,তবেই একমাত্র আগামী বছর রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে বিধানসভা নির্বাচন করা সম্ভব। যেখানে আপামর মানুষ তাঁর নিজ নিজ গণতান্ত্রিক অধিকার অবাধে প্রয়োগ করতে পারবে। ফলস্বরূপ রাজনৈতিক হিংসা সমাপ্ত হয়ে রাজ্যে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে।

(লেখক অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা)

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

২০ জুন ১৯৪৭ পশ্চিমবঙ্গের জন্মলগ্নের পর, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যরাত্রের স্বাধীনতার পথ ধরে স্বাধীন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে 'হিন্দু হোমল্যান্ডের' যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে অগ্নিগর্ভ বামপন্থী আন্দোলনে রাজ্যের পশ্চাদপসারণের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জর্জরিত উদ্বাস্তু স্রোত, ১৯৭১-এর নির্বাচনের নামে প্রহসন এবং ১৯৭২-এর ভোট লুটের পর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠিত হয়। ২৫ জুন ১৯৭৫ জরুরি অবস্থার কালো রাত্রি সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও নেমে আসে। বামপন্থী দলতন্ত্রের আগলে শ্বেত সন্ত্রাসকে অতিক্রম করে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ নিমজ্জিত হয় ৩৪ বছরের বাম অপশাসনে। বাম জমানার শেষলগ্নে সিঙ্গুরকে বাস্তবায়নের অক্ষমতা ও নন্দীগ্রামের 'হাড়হিম' করা সন্ত্রাসের পথ ধরে পরিবর্তনের ধ্বজা তুলে ২০১৯ সালে মা-মাটি-মানুষের সরকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। 'বদলা নয় বদল চাই' প্রভৃতি মুখরোচক স্লোগানের আড়ালে জরুরি অবস্থার গহ্বর থেকে উঠে আসা নেত্রীর দাঁত নখ বেরিয়ে আসতে বেশি সময় লাগেনি। পশ্চিমবঙ্গকে অনতিবিলম্বে দলতন্ত্রের বজ্রআটুনি, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ, অনুপ্রবেশ, সংখ্যালঘু তোষণ ও জিহাদি কারবারিদের আঁতুড়ঘরে পরিণত করতে নেত্রী সময় নেননি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হিন্দু হোমল্যান্ড হিন্দু নিধনের পরীক্ষাগারে পরিণত হয়। নারী পাচার, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী শাসিত পশ্চিমবঙ্গের রোজনামচা। দিল্লির নির্ভয়ার ঘটনার থেকেও ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে থাকে উত্তর চব্বিশ পরগনার কামদুনি থেকে উত্তর দিনাজপুরের চোপরার সদ্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রীর সঙ্গে। লাভজিহাদের নামে পশ্চিমবঙ্গের প্রজ্ঞা দেবনাথ আয়েশা জন্নত মোহনায় পরিণত হয়ে নব্য জেএমবি-র মহিলা শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে কিন্তু সে পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার হয় না, গ্রেপ্তার হয় বাংলাদেশে। বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণের আগে এই তথ্য আমাদের অজানা ছিল যে এখানে বসে জেএমবি জঙ্গিরা খারিজি মাদ্রাসার আড়ালে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা করে চলে। গয়া বিস্ফোরণ কিংবা ঢাকার হোলি আর্টিসান বেকারি বিস্ফোরণের নামকরা উগ্রপন্থীদের চারণভূমি পশ্চিমবঙ্গে ধরা পড়ে। বাংলাদেশের গণহত্যার নায়করা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিশ্চিন্তে রাত কাটায়।

পুরুলিয়ার ত্রিলোচন মাহাতো থেকে হেমতাবাদের বিধায়ক দেবেন্দ্র রায়কে মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। মাওবাদী ছত্রধর মাহাতোর ছাতার নীচে বড়ো হওয়া নেত্রী ছত্রধরকে রাজ্য কমিটিতে জায়গা দিয়ে বুঝিয়ে দেন তিনি অতি বামপন্থতেও আছেন আবার অহিংস গান্ধীর কংগ্রেসেও আছেন। ঝাড়গ্রামের একের পর এক রাজনৈতিক হত্যা ও জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণের দায়ে তবে কার? রাজনৈতিক হত্যার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এখানে শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ বিজেপি কর্মী-নেতারা খুন হন না; কংগ্রেস, সিপিএম এমনকী তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হয় আমার রাজ্য। পাডুইয়ের সাগর ঘোষ, কৃষ্ণগঞ্জের সত্যজিৎ বিশ্বাস, নোয়াপাড়ার বিকাশ বসু, ভদ্রেশ্বরের মনোজ উপাধ্যায়, বাগনানের শেখ আসাফুল

রহমান এই হত্যাগুলি স্বপক্ষে রক্তক্ষয়ের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

বিচারবিভাগীয় কমিশনের রিপোর্ট হিমঘরে পাঠাতে মমতার জুড়ি মেলা ভার। ১৯৯৩-এর ২১ জুলাইয়ের গুলি চালানোর ঘটনায় ২০১১ সালে বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গঠিত কমিটি রিপোর্ট জমা দেয় কিন্তু শোনা যায় মূল অভিযুক্ত মণীশ গুপ্ত প্রথমে মন্ত্রী ও পরে রাজ্যসভার সদস্য হন। ২০১১ সালে বিচারপতি অরুণাভ বসুকে নিয়ে গঠিত সাঁইবাড়ি হত্যালীলার রিপোর্ট জমা পড়ে কিন্তু কার্যকর হয় না। বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী হত্যা তদন্তে ২০১২ সালে বিচারপতি অমিতাভ লালার নেতৃত্বে কমিশনের রিপোর্ট এখনও দিনের আলো দেখেনি। কাশীপুর বরানগর গণহত্যায় ২০১২ সালে গঠিত প্রথমে বিচারপতি এ কে বিশি ও পরে বিচারপতি ডি পি সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট মুখ থুবড়ে পড়ে। শুধু কমিশনের রিপোর্ট কেন, উচ্চন্যায়ালয়ের রায় কার্যকর করতে মমতা সরকারের অনীহা সুবিদিত।

ইতিপূর্বে ভারতে প্রায় ১২৫ বার এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫ বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৫১ সালে ২০ জুন পঞ্জাবে প্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৫৯ সালে কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ সরকার এবং ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলে দিতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে কোনো রাজ্যে নির্বাচিত সরকার সরিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতে পারে। এস আর বোম্বাই বনাম ভারত সরকার মামলার রায় দান প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট অভিমত ব্যক্ত করেন যে কতগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতে পারে—

(১) রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি ঘটলে ও জনজীবন বিপর্যস্ত হলে।

(২) রাজ্যে সরকার রাজ্য শাসনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলে।

(৩) সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে বা রাজ্য সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করলে।

(৪) জাতীয় সংহতি বা জাতীয় নিরাপত্তার

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়ার দুই বিজেপি সমর্থককে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্র বিরোধিতার নামে শাসক দলের মদতে দুদিন ধরে এভাবেই রাজ্যজুড়ে চলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব।

ক্ষেত্রে হানিকর পরিস্থিতির উদ্ভাবন ঘটলে অথবা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলে।

(৫) সংবিধান লঙ্ঘিত হলে, সংবিধান বিরোধী কাজ করলে অথবা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগণের মধ্যে চূড়ান্ত অনৈক্য দেখা দিলে।

সারকারিয়া কমিশনের মত অনুসারে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চূড়ান্ত বা সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সর্বোপরি রাজ্যে তখনই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায় যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে রাজ্যের সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কাজ করতে ব্যর্থ। পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করে দেখা যাবে সবক্ষেত্রে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান।

প্রথমত, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছে। বিরোধী রাজনীতির পরিসর যেমন সংকুচিত তেমনি শাসক দলের মন্ত্রী, নেতা বা মন্ত্রীদের যে কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক হত্যা বা মিথ্যা 'বাংলার গর্বের' নামে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, পেন-পেনসিলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, ছাত্র ভর্তিতে দুর্নীতি, সরকারি চাকরিতে স্বজনপোষণের দুর্নীতি নিত্যদিনের ঘটনাতে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থত, মাওবাদী থেকে অনুপ্রবেশকারীদের দেশ-বিরোধী কার্যকলাপকে প্রচ্ছন্ন মদত দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গকে কখনো মাওবাদী, কখনো হুজি, কখনও-বা জেএমবি-র অবাধ মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হতে দেওয়া। নাগরিকত্ব বিল সংসদের নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষে পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরের পর নাগরিকত্ব আইনে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীরের দেশ বিরোধী সংগঠনের মতো রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন মাননীয়া। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চলে। কখনো প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের সম্পাদককে জেরার নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থানায় বসিয়ে রেখে পদত্যাগে বাধ্য করা। আরামবাগ টিভির মালিককে গ্রেপ্তার করা, সরকার বিরোধী মন্তব্যের জন্য কলকাতা নিউজের সম্প্রচার বন্ধ করা ইত্যাদি অনুপ্রেরণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

পঞ্চমত, পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা দখলের স্বার্থে শাসকদল পশ্চিমবঙ্গকে ব্লাড আইল্যান্ডে পরিণত করছে। ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনকামী উন্নয়নমুখী গণতান্ত্রিক পরিসরে সরকার গড়তে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে মা-মাটি- মানুষের সরকার অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বিশ্বাসী নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সোনালি ভোরের তাগিদে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে নিশ্চিত করতে এবং হার্মাদ থেকে, উন্মাদকে দূরে রেখে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের বাস্তবতা সৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

(লেখক অধ্যক্ষ, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ, কলকাতা)

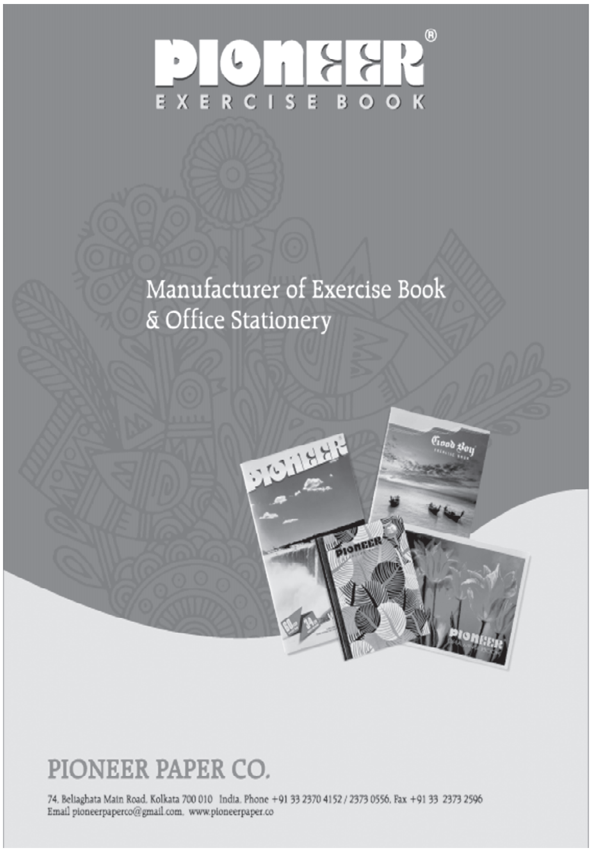

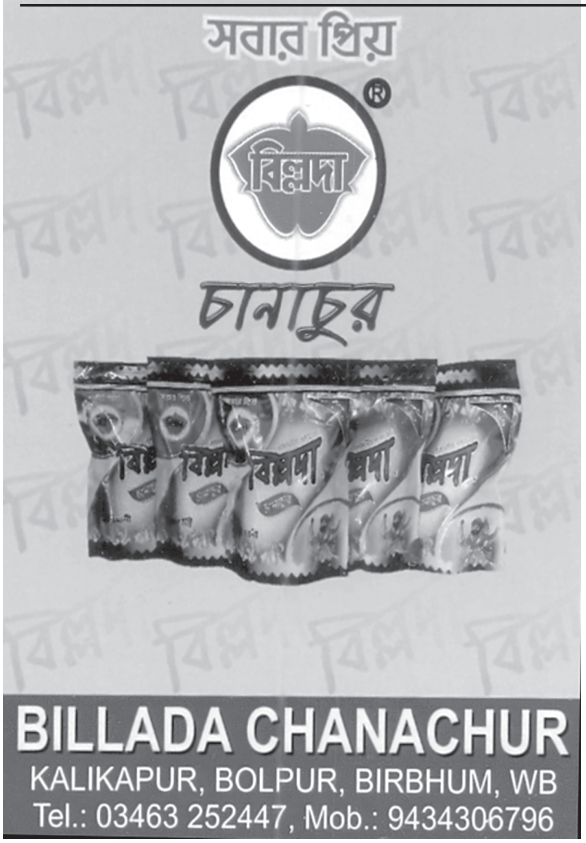

বিশেষ নিবন্ধ

আগ্রাসনের দিন শেষ, গালওয়ান পর্বে চীনকে বুঝিয়ে দিল ভারত

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

১৯৬২ এখন অতীত। ফেলে আসা ৫৮টি বছরে গালওয়ান নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। তার সঙ্গেই গালওয়ান উপত্যকায় সমাধি হয়েছে '৬২-র ভারতের নেতৃত্বহীনতা, নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা, দুর্বল বিদেশনীতি ও কূটনৈতিক বিফলতা। তার সঙ্গেই দেশের জনমনাসে বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে ২০২০-র ভারতের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি, সফল বিদেশনীতি ও কূটনীতির প্রতি, নেতৃত্বের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার প্রতি। আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম দেশের সেনাবাহিনীর মনোবল শতগুণ বৃদ্ধি করেছে। দেশ পেয়েছে বিপুল আন্তর্জাতিক সমর্থন। ১৯৬২-র ভারত ও ২০২০-র ভারতের মধ্যে যে আকাশ- পাতাল পার্থক্য, চীন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

২০১৪ সালের পরবর্তী অধ্যায়ে ডোকালাম, গালওয়ান-সহ একাধিক স্থানে চীনা সৈন্যের চোখে চোখ রেখে তাদের অনুপ্রবেশের ছক বানচাল করে দিয়েছে আমাদের সাহসী ভারতীয় জওয়ানরা। ২০২০-র নবভারত বিশ্বশান্তি, সুস্থিতির পক্ষে। কিন্তু শান্তি ভঙ্গ করে কোনো দেশ যদি ভারত ভূখণ্ডের দিকে হাত বাড়ায়, অনৈতিক অতিক্রম করে আমাদের ভূখণ্ডকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে সেই কালো হাত গুঁড়িতে দিতে সমর্থ ২০২০-র নবভারত। ২০১৪-তে মোদীজীর নেতৃত্বাধীন যে সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছে তারা দেশের অখণ্ডতার সঙ্গে আপোশ করে আর একটি 'আকসাই চীন' ও আর একটা 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর' হতে দেবে না— এই সত্যটা চীন ও পাকিস্তানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন অনিবার্য ভাবে অনেকের মনেই দেখা দিতে পারে যে, এই বিশ্ব মহামারীর সময় যখন পৃথিবী জুড়ে জীবন জীবিকা রক্ষায় তীব্র সংগ্রাম দেখা দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলো যখন স্বাস্থ্যপরিষেবার মানোন্নয়ন-সহ মহামারী সংক্রান্ত নানা কর্মপন্থা রূপায়ণে ব্যস্ত,

তখন চীন হঠাৎ দেশের ভৌগোলিক ভূখণ্ড নিয়ে এত আগ্রাসী হয়ে উঠল কেন? আপাতদৃষ্টিতে নিয়ে আগ্রাসন মনে হলেও এর পিছনে চীনের গভীর ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথম কারণটি অবশ্যই কূটনৈতিক। বিশ্ব মহামারী সংকট পর্বে চীন যখন সারাবিশ্বকে SARS-Cov-2 ভাইরাস উপহার দিয়েছে, ভারত তখন বিশ্বকে দিয়েছে এই মহামারী থেকে বাঁচার ওষুধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন। সংকটের সময়, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে চীনের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি অত্যন্ত বিরক্ত। অন্যদিকে মহামারী মোকাবিলায় ভারতের দায়িত্বশীল ভূমিকা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। সংকটময় মুহূর্তে বিশ্ব দরবারে ভারতের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতায় কূটনৈতিক ভাবে কোণঠাসা হয়েছে চীন। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রবল আন্তর্জাতিক সমর্থন যে ক্ষমতার বিন্যাস পূর্ব এশিয়ায় চীন থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে— তাও বিলক্ষণ জানে চীন। মোদী সরকারের সফল বিদেশনীতির ফলে পূর্ব এশিয়ায় জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে

ভারতের দৃঢ় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ওই অঞ্চলে যে চীন-বিরোধী অক্ষ স্থাপিত হয়েছে তাও শি জিনপিংয়ের কপালে ভাঁজ ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। ভারতের এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ও ভীত হয়ে চীন আগ্রাসনের পুরানো অস্ত্রে সান দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে চতুর্দেশীয় সামরিক অক্ষ স্থাপিত হয়েছে, দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের দাদাগিরির মোকাবিলায় তা ভীষণ কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। QSD বা কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সম্মিলিত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বিপুল। তাই কোয়াডের উপস্থিতি চীনের অন্যতম মাথাব্যথার কারণ। কোয়াডের আক্রমণ যদি চীনা ভূখণ্ডে নেমে আসে, তাহলে চীন ধূলিসাত হয়ে যাবে।

তৃতীয় কারণটি অর্থনৈতিক। মহামারী-পরবর্তী পৃথিবীতে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা বড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। পৃথিবী জুড়ে প্রায় একশোটি বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যগোষ্ঠী তাদের চীন থেকে সরিয়ে নিতে চাইছে। তাদের অধিকাংশেরই নতুন গন্তব্য ভারত। জাপান তাদের দেশীয় সংস্থাগুলোকে চীন থেকে বিনিয়োগ অন্য দেশে সরানোর জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেবার কথা ঘোষণা করেছে। ভারতও ওইসব কোম্পানিগুলির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং তাদের এদেশে বিনিয়োগ করার জন্য রাজি করাচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য 'সেভ কার্পেট' পেতে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

এছাড়াও নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার যেভাবে ভারতীয়দের দেশীয় পণ্য ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে এবং দেশীয় সংস্থান সম্প্রসারণে, পুনরুজ্জীবনে ও আধুনিকীকরণে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেছে, তাতে চীন প্রমাদ গুনছে। শুধু ভারতই নয়, বিশ্বজুড়ে চীনা পণ্য বর্জনের পক্ষে জনমত তৈরি হচ্ছে। চীনের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্র প্রবল ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা করে, সেদেশের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতে অস্থিরতা তৈরি করে বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছে সীমান্ত আগ্রাসনের মধ্যে দিয়ে। চীনের চক্রান্ত ছিল, ভারতে অস্থিরতা তৈরি করতে পারলে বিনিয়োগকারীরা ভারতে আসবেন না , ফলে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু ভারতীয় সেনার সাহসিকতা ও মনোবল চীনের চক্রান্তকে বানচাল করে তার আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দিয়েছে।

প্রবল আন্তর্জাতিক চাপ, ভারত সরকারের দৃঢ়তা ও ভারতীয় সেনার সাহসিকতার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে চীন। এনএসি বা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে নিজেদের এলাকায় ফিরে গেছে চীনা সৈন্য। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত জিইয়ে রাখাই চীনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। আর তাদের এই ভূমিকার জন্যেই আন্তর্জাতিক মহলে তারা নিন্দিত, সাম্প্রতিক সময়ে যা আরও তীব্র হয়েছে। এই মুহূর্তে ভারত-সহ বিশ্বের অন্যান্য শক্তিধর দেশগুলোর চীন সম্পর্কে যা মনোভাব, তাতে চীনের এই অসভ্যতা তারা আর বেশিদিন সহ্য করবে বলে মনে হয় না। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ডোকালাম, গালওয়ানের পর এই পদক্ষেপ চীন যতবার করবে, ভারত তার সমুচিত জবাব দেবে। গালওয়ানের সেই অভিশপ্ত রাতে ভারতীয় সেনার পরাক্রম, সরকারের দৃঢ়তা, দেশবাসীর সদর্থক মনাভাব এবং দেশের প্রতি প্রবল আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রমাণ করে এই ভারত ১৯৬২-র ভারত নয়, এই ভারত ২০২০-র নতুন ভারত। ▮

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **91702008498310**0

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ রচনা

ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বে আরও তীব্র হয়েছে

ড. মনমোহন বৈদ্য

ভারতের বিদেশনীতি, সুরক্ষানীতি ও অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ভারতবাসী-সহ সমগ্র বিশ্ব এক নতুন ভারতকে অনুভব করছে। কারণ আজ বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষানীতি পরিবর্তনের জন্য ভারতীয় সেনার মনোবল ও শক্তি বেড়ে গেছে। ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। অধিক থেকে অধিকতর দেশ ভারতকে সমর্থন করছে এবং সহযোগিতা করতে আগ্রহী। ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্য হওয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ১৯৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৮৪ জন সদস্যের ভারতকে সমর্থন করা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জন্য ভারতের প্রস্তাবটিও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্যের অনুমোদন পেয়েছে। সৌরশক্তি-সহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে ভারতের উদ্যোগ ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী ভারত সমগ্র মানবতা ও পরিবেশের জন্য এক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রমাণিত হবে। কারণ ভারতের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি কোনো প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব নয়, আলাপআলোচনা; সংঘর্ষ নয়, সমন্বয় এবং কেবল মনুষ্যজগৎ নয়, সমগ্র বিশ্বচরাচরের সম্পর্কে একাত্ম ও সর্বাঙ্গীণ ভাবনা সমন্বিত। এটি বিশ্বের এমন একটি অনন্য দেশ যা কেবল নিজের সম্পর্কেই চিন্তা করে না। আমাদের সাংস্কৃতিক দর্শন সম্পূর্ণরূপে অন্যরকম।

অর্থনীতিতে প্রচুর পরিবর্তন প্রয়োজন, তবে দ্রুত চলমান অর্থনৈতিক চক্রের কারণে এ জাতীয় মৌলিক পরিবর্তনগুলি করা সহজ কাজ নয়। বর্তমানে করোনা মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক চাকা থেমে যাওয়ার মতো হয়ে পড়েছে। এই সময়ে ভারত সরকার অর্থনৈতিক নীতিগুলির সংশোধন করার ইচ্ছা দেখিয়েছে। কিন্তু ৭০ বছরের অর্থনীতির পুনর্যোজিত (realignment) করার জন্য সাহস, দুরদৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি ধৈর্যসহ, সতত সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রচেষ্টায় নিজের একাত্ম, সর্বাঙ্গীণ, সর্বসমাবেশক মৌলিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বর্তমান প্রসঙ্গটি বিবেচনা করে যুগোপযোগী নতুন গতিবিধিকে স্বীকার করে যোজনা তৈরি করতে হবে। ভারত এখন এই দিকেই এগিয়ে চলেছে। এখন ভারত নিজেকে 'ভারত' হিসেবে অভিব্যক্ত করছে আর অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্ব এটিকে দেখেছে এবং অনুভব করছে। এই পরিবর্তন ভারতকে বিশ্বের কাছে কিছুটা নতুন করে অনুভব করাচ্ছে এবং ভারতকেও নিজের কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে।

কয়েক দশকের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ যে জাতীয় জাগরণ ঘটেছে তার এই মৌলিক পরিবর্তনের ফল বামপন্থী এবং তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, লালিত সাংবাদিক ও তথাকথিত লিবারেল, বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের 'রাষ্ট্রবাদী' হিসেবে জাহির করে নিরন্তর এর বিরোধিতা করে চলেছে। আসলে এটি 'রাষ্ট্রীয়' আন্দোলন; 'রাষ্ট্রবাদী' নয়। 'রাষ্ট্রবাদ' শব্দ ভারতীয় নয়, এর ধারণাও ভারতীয় নয়। এর উৎপত্তি পশ্চিমের জাতি-রাষ্ট্র (nation-state) থেকে। সেই কারণে ওখানে ন্যাশনালিজম্ অর্থাৎ রাষ্ট্রবাদ। পশ্চিমের এই রাষ্ট্রবাদ বিশ্বে দুটি বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে। এদের জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদের ফসল। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদ সাম্যবাদের শ্রেণীভুক্ত। রাশিয়া দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিজের কমিউনিস্ট মতাদর্শ মধ্য এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তা সর্বজনবিদিত। একই ভাবে চীন কীভাবে জোর করে নিজের আগ্রাসী প্রবৃত্তি হংকং ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে চীনা সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় দিচ্ছে তা বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। অনুমান করা যায় যে চীন তার সীমান্তবর্তী ৬টি দেশের ৪১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা বেআইনিভাবে দখল করেছে এবং ২৭টি দেশের সঙ্গে তাঁর বিবাদ রয়েছে সীমানা নিয়ে। এইজন্য বিশ্বের বেশিরভাগ দেশকে চীনের সাম্রাজ্যবাদ বা সুপার ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতীয় চিন্তায় রাষ্ট্রবাদ নয়; রাষ্ট্রীয়তার ভাব রয়েছে। আমরা রাষ্ট্রবাদী নই, আমরা রাষ্ট্রীয়। সেই কারণে সঙ্ঘের নাম রাষ্ট্রবাদী স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নয় , রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। আমাদের কোনো রাষ্ট্রবাদ আনার দরকার নেই। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়তার ধারণা ভারতের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে স্টেট নয়, পিপল(মানুষ)-কে রষ্ট্রের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ভারতের জনগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বহু জাতপাত রয়েছে, বহু দেব-দেবীর উপাসনা হয়। তাঁরা অধ্যাত্মভিত্তিক একাত্ম ও সর্বাত্মক জীবন দর্শনকে নিজের বলে বিবেচনা করে। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ সমাজ এবং এই ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে নিজেদের বিবেচনা করি। সত্যকে তাঁর প্রাচীন বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা এবং বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিতে আচরণ করা ভারতে জাতীয়তার প্রকাশ। আমাদের এই অভিন্ন পরিচয় ও আমাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃভাব প্রকাশের মাধ্যমে সমাজকে স্নেহের সঙ্গে প্রদানের সংস্কার জাগ্রত করার এক জাতীয় অনুভতি জাগ্রত করার প্রয়াস। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই জাতীয়তার ভাব প্রকট হওয়াই জাতীয় পুনর্গঠন। এটি জাতীয় আত্মার জাগরণ ও প্রকাশ।

চীনের সম্প্রসারণবাদী আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্ররিপ্রেক্ষিতে ভারতের জবাব ও প্রতিক্রিয়ার সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা নিয়ে বামপন্থীরা প্রচার করেছে যে ,এটি ভারতের 'সুপার ন্যাশনালিজম্'। বাস্তবে বামপন্থীরা কখনোই ভারতবর্ষের আত্মাকে বুঝতে পারেনি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যা দেখা যাচ্ছে তা এখনও পর্যন্ত ভারতকে দমন করা, অস্বীকার করা। ভারতবর্ষের ভাবনাই

'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ও 'সর্বেপি সুখিনঃ সন্তু'। তাই এই আত্মজাগরণ ও আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে শক্তিসম্পন্ন হওয়ার যোজনা কারও ভয়ের কোনো কারণ হতে পারে না, কারণ ভারত জেগে উঠছে।

ভারতের মধ্যেই ভারতের 'আত্মা' প্রকাশের বিরোধিতা করা কোনো নতুন বিষয় নয়। স্বাধীনতার পরে জুনাগড় রাজ্য ভারতের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার কাজটি সম্পন্ন করার পর ভারতের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ গিয়েছিলেন। সোমনাথ মন্দির ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মন্দির। তিনি এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। যেহেতু দেশ ইতিপূর্বেই স্বাধীনতা পেয়েছে সেজন্য তিনি মনের মধ্যে ভারতের এই গর্বের স্থানটি পুনরুদ্ধারের সংকল্প করেছিলেন। এই পুনরুদ্ধারের কাজের দায়িত্ব তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস কে এল মুন্সীকে অর্পণ করেছিলেন। সর্দার যখন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এই সমস্ত তথ্য নিয়ে আলোচনার করেন, তখন গান্ধীজী এটি নীতিগতভাবে সমর্থন করেছিলেন। তবে তিনি শর্ত দেন যে, মন্দিরের পুনর্নির্মাণ সরকারি অর্থের সাহায্যে না হয়ে জনগণের দ্বারা সংগৃহীত তহবিলের মাধ্যমে হবে। এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়। তৎকালীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সেই অনুষ্ঠানে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু পণ্ডিত নেহরু এতে ঘোরতর আপত্তি জানান। তিনি এটাকে হিন্দুর পুনরুত্থান (Hindu revivalism) বলে বিরোধিতা করেন। যদিও সর্দার প্যাটেল, কে এল মুন্সী, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মহাত্মা গান্ধী সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণকে ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার হিসেবে দেখেছিলেন। এই ঘটনায় স্পষ্ট যে, ভারতের আত্মাকে অস্বীকার করা, তাকে প্রকাশে হতে না দেওয়া ইত্যাদি বিরোধিতা তখনও ছিল। এর জন্য সুসংহত প্রয়াস করা হয়েছিল। তবে সে সময় কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় বিচারধারা মনোভাবাপন্ন প্রচুর লোক ছিলেন, সেজন্য মন্দির পুর্নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। পরে ক্রমশ যোজনাবদ্ধ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় বিচাসম্পন্ন নেতৃত্বকে প্রান্তিক করা হচ্ছিল এবং কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কমিউনিজম আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে না শুধু নয়, তারা 'রাষ্ট্র' ভাবনাকে গ্রহণই করেনি। কমিউনিজম প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের মতো এক ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতিনিধি। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এখন চীন এই সম্প্রসারণবাদী ও সর্বগ্রাসী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। বামপন্থীরা ভারতের 'আত্মা'কে বুঝতে অসমর্থ বা ইচ্ছাকৃত ভাবে এর বিরোধিতা করছে যাতে এই দেশটি এক সূত্রে গ্রথিত না হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে দুর্বলভাবে হয়ে পড়ে।

তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের আশু কর্তব্য কী? ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে একটি রূপরেখা এঁকেছেন। এটা সত্য যে তিনি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। এর কারণ পশ্চিমি উপনিবেশবাদ ও বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি। 'স্বদেশী সমাজ' নিবন্ধে তিনি ভারতের আত্মা ও জাতীয়তার প্রতি তাঁর পক্ষপাত তিনি প্রমাণিত করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন— ''আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার বিধান। ইংরাজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায় --- আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

... আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন— ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো

ভারতের আত্মাকে জাগ্রত করে ভারতের আত্মপ্রকাশের সময় এসেছে। এই প্রক্রিয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং তাঁর আশীর্বাদে শুরু হয়ে গেছে। ভারতবিরোধী বিদেশি শক্তি ভারতের এই আত্মাকে অস্বীকার করার যতই প্রচেষ্টা করুক না কেন তা ব্যর্থ হবে। কারণ ভারতের জনগণের সংকল্প এখন দৃঢ় হয়েছে।

সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না— এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই দেশ-বিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব তাহা নহে, ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন— তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন।

ঐক্যসাধনাই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে। ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্ব স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্বে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন—যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া, দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো।"

ভারতের আত্মাকে জাগ্রত করে ভারতের আত্মপ্রকাশের সময় এসেছে। এই প্রক্রিয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং তাঁর আশীর্বাদে শুরু হয়ে গেছে। ভারতবিরোধী বিদেশি শক্তি ভারতের এই আত্মাকে অস্বীকার করার যতই প্রচেষ্টা করুক না কেন তা ব্যর্থ হবে। কারণ ভারতের জনগণের সংকল্প এখন দৃঢ় হয়েছে। ভারতের জাতীয়তা জাগ্রত করার বিশ্বজুড়ে এই কর্মকাণ্ডকে কয়েক দশক ধরে কয়েক প্রজন্ম খ্যাতি ও প্রশংসা থেকে দূরে থেকে 'বিশ্ব মঙ্গলের সাধনায় আমরা এক নীরব পূজারি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্ব মঙ্গল সাধনার পূজারিদের এই তপস্যা ও পরিশ্রম সফল হবেই।

ভারতের আত্মাকে শক্তি ও গৌরবের সঙ্গে পুনস্থাপিত করার এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সমস্ত ভারতবাসী তাদের রাজনীতি ও অন্য সব স্বার্থ একধারে রেখে দিয়ে একতার পরিচয় দিন এবং স্বাভিমানী আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণে সহভাগী হন— এটাই প্রার্থনা।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ। ভাষান্তর রিঙ্কু রায়)

শোক সংবাদ

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর খণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার পালক কার্যকর্তা সমীর পাত্রের মাতৃদেবী সুমতি পাত্র গত ২৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

SKJ CONSULTANT & FINANCIERS PVT. LTD.

(FRANCHISEE OF ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED)

TIN FACILITATION CENTRE & PAN CENTRE

CERTIFIED FILING CENTRE FOR MCA-21

E-FILING OF INCOME TAX RETURN

5, Commercial Building, Ground Floor,

23A Netaji Subhas Road , Kolkata-700 001,

Phone : 2242-8964, 4005-0066

E-mail : sunil_skj@rediffmail.com,

sunil_skj@hotmail.com,

sunilskj10@gmail.com

H.O. : 6, Commercial Building, 1st floor,

23A, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

বিশেষ প্রতিবেদন

অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের পুনর্নির্মাণ স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ কাজ

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

পুণ্যসলিলা সরযূতটে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি মোক্ষদায়িনী অযোধ্যায় ভব্য রামমন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ ৫ আগস্ট ২০২০ ভূমিপূজন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভারম্ভ হবে। এই মহানলগ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পূজ্যসন্ত, বিদ্বজ্জন, শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। রামজন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে মহান অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত হবে। শ্রীরামমন্দির সামাজিক সমরসতা, রাষ্ট্রীয় একাত্মতা এবং হিন্দুত্বের ভাব জাগরণের দেদীপ্যমান প্রতীক। শত শত বছরের তপস্যা, রামভক্তদের বলিদান, আপামর দেশবাসী ও বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার এই পবিত্র মুহূর্ত আমরা এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে উদযাপন করতে চলেছি।

ভারতীয় ইতিহাস, পরম্পরা, সংস্কৃতি অযোধ্যার সঙ্গে যুক্ত। শ্রীরাম আর অযোধ্যার কোনো পার্থক্য নেই। ভারতের আধ্যাত্মিক জগৎও অযোধ্যার ইতিহাস এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাবধারার অভিব্যক্তিতে ভরপুর। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় একাত্মতার প্রতীক। ভারতের উত্থান-পতনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেইজন্য বিদেশি আক্রমণকারী ও ভারতবিরোধী চক্রের বিরোধিতার কেন্দ্রবিন্দুতে সব সময় উঠে এসেছে অযোধ্যা ও শ্রীরামচন্দ্রের নাম। তাই বিদেশি আক্রমণকারীরা প্রায় ৫০০ বছর ধরে অযোধ্যা ও ভারতের শ্রদ্ধাকেন্দ্রের উপর বারে বারে আক্রমণ করেছে। সতত সংঘর্ষ হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে শ্রীরামজন্মভূমি ফিরে পেতে প্রায় ৭০ বছর আইনি লড়াই চলেছে। গত ৯ নভেম্বর ২০১৯ সুপ্রিমকোর্ট রামমন্দির পুনর্নির্মাণের পক্ষে রায় দেয়। রামলালা বিরাজমান যেখানে সেখানেই মন্দির নির্মাণের

কাজ আরম্ভ হবে।

ভারত তথা বিদেশের রামভক্তরা দূরদর্শনের পর্দায় শিলান্যাস অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আগ্রহ করা হয়েছে ৫ আগস্ট বেলা ১১-৩০ মিনিট থেকে ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার মূর্তির সামনে ভজন, কীর্তন, পূজা অনুষ্ঠান করুন। পরে পুষ্পাঞ্জলি ও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে রামমন্দির নির্মাণের জন্য ধন সমর্পণ করার সংকল্প নিন। করোনা আবহের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত নিয়ম মেনে অনুষ্ঠান করতে হবে। সন্ধ্যায় মঠ, মন্দির, গ্রাম মহল্লায় নিজ নিজ বাড়িতে পরম্পরা অনুসারে সাজসজ্জা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দীপোৎসব পালন করুন। শিলান্যাসের জন্য সারাদেশ থেকে পবিত্র নদীর জল এবং তীর্থক্ষেত্রের মাটি একত্রিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ি, জল্পেশ মন্দিরের মাটি এবং গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, তিস্তা, তোর্সা ও বীরভূমের জয়দেবের মাটি ও অজয়নদের জল অযোধ্যায় পাঠানো হয়েছে। সবার পরশে পবিত্র তীর্থ নীরে, পুণ্যভূমি ভারতের মাটি একত্রিত করে ভারতের স্বাভিমানের প্রতীক হিসেবে রামমন্দিরের পবিত্র সিলান্যাস অনুষ্ঠানের শুভ মুহূর্তের সাক্ষী আমরা সকলেই থাকব।

শ্রীরামমন্দির নির্মাণ এক সংঘর্ষময় ইতিহাস। সে সম্পর্কে আমরা কম-বেশি সকলে অবগত আছি। সংঘর্ষের এই দীর্ঘ লড়াইয়ে হিন্দু সমাজ কখনোই পরাজিত হয়নি। সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকেনি। স্বাধীন ভারতে রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের জন্য বিভিন্ন সময় নানা ধরনের জনজাগরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। রামলালার তালা খোলা, রামশিলা পূজন, রামপাদুকা যাত্রা, রামজানকী রথযাত্রা, করসেবা, শ্রীরামজপযজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ায় অযোধ্যা বিতর্কের সমাপ্তি হয়। সমস্ত মত, পন্থ, সম্প্রদায়, সাধুসন্তদের ইচ্ছানুসারে এবং সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ৫ আগস্ট ২০২০ ভারতীয়ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার শুভসূচনা হতে চলেছে পবিত্র অযোধ্যাধামে। করোনা মহামারীর আতঙ্কের মধ্যেও এই অনুষ্ঠান সমাজকে অনুপ্রেরণা দেবে।

শ্রীরাম কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের মহাপুরুষ। তাঁর সময়কালে সমাজে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ছিল না— ছিল কেবল মানবতা। মানবতার কল্যাণেই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজ আমরা জাতি, সম্প্রদায়ে বিভক্ত, পূজাপদ্ধতি, আচার আচরণে ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু আমরা সকলে একই সনাতন সংস্কৃতির ধারক- বাহক। সকলেই ভারতমাতার সন্তান। এই মনোভূমিকা নিয়েই রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ— যা স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ কাজ।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা)

বিশেষ রচনা

এক করোনাজয়ীর আত্মকথা

করোনা এক অমানবিক মুখ

জয়ন্ত পাল

ক্রিং ক্রিং............

— হ্যালো কোথা থেকে বলছেন?

—আমি স্বপ্নলোক নার্সিং হোম থেকে বলছি। ইন্দ্রজিৎ সেন কে হয় আপনার?

—আমার বাবা। আমি ওনার ছেলে বলছি, কুমারজিৎ।

—আচ্ছা মিঃ সেন, বলতে খারাপ লাগছে তবু খবরটা তো আপনাকে দিতে হবে।

উৎগ্রীব ভাবে প্রশ্ন করলাম। —'কিন্তু কি হয়েছে বাবার? বাবা সুস্থ আছেন তো?' আমার পা দুটো কাঁপছে।

—না না আপনার বাবা আগের মতোই আছেন। এই মুহূর্তে ওনার সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ওনার কোভিড ১৯ পজেটিভ।

—কী বলছেন? রিপোর্টটা ইন্দ্রজিৎ সেনের তো?

---আপনি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে এখানে আসুন।

ফোনটা কেটে গেল। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মা ছুটে এলো। সে কী রে, কী করে হলো! মা আমি কী করব? কেমন করে বাবাকে বাঁচাবো? মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দুজনের চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

তারপর নিজেকে কিছুটা সংবরণ করে নিয়ে মা বলল তোর সেজ কাকার অনেক হাসপাতালে যোগাযোগ আছে ওকে একবার ফোন কর।

কুমারজিৎ প্রথমে স্থির করল যে নার্সিং হোমে যে ডাক্তার বাবাকে দেখছেন তাঁকেই একবার ফোন করে কথা বলে।

তিনি বললেন—আমার কাছেও রিপোর্টটা এসেছে কিন্তু আমি এখানে খুব একটা ভরসা পাচ্ছি না। একটা বড়ো কোনো সেটআপে ওনাকে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করো। যেখানে কমপক্ষে ভেন্টিলেটর আছে।

সেজকাকা কয়েক জায়গায় চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। বলল — 'না কোথাও বেড নাই। যেখানে আছে ওখানেই রাখো। একান্তই যদি স্থানান্তর করাতে হয় তবে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিতে হবে।' মনে হলো যেন একটা দায়সারা গোছের সাজেশান।

ন-কাকা বলল, দেখ আমি ওখানে যেতে পারব না। কারণ আমার অফিস জানতে পারলে ১৪ দিন অফিসে কাজ করতে দেবে না। যদি টাকাপয়সার প্রয়োজন হয় বলিস লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

মা বলল এখন জেঠুকে খবর দিস না, কারণ তার শরীর খারাপ। কান্নাকাটি করবে।

কী করব দিশেহারা অবস্থা। কাকে বলব? কে ভর্তির ব্যবস্থা করবে? কোথায় বেড পাওয়া যাবে? মনের মধ্যে তোলপাড় হয়ে চলেছে। হঠাৎ অমানিশদার কথা মনে পড়ল। আমার শিক্ষক। ওনার কাছে প্রাইভেটে মেডিসিন পড়তাম। উনি এম.আর.সি.পি। দুঃসময় যখন আসে দিশেহারা অসহায় মনে হয় নিজেকে। কোথাও কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না কিন্তু তার মধ্যে যেন একটু আলোর উঁকি। দর্যোগপূর্ণ তমসাছন্ন অন্ধকারে মনে হলো যেন ক্ষণপ্রভার প্রভাদান।

কিন্তু কী আশ্চর্য! একটা ফোনেই স্যারকে পেয়ে গেলাম। এক নিঃশ্বাসে মনের সমস্ত আবেগ, কান্না সব উজাড় করে দিলাম। স্যার শান্তভাবে সব শুনলেন তারপর আমাকে বললেন, তোকে অত চিন্তা করতে হবে না। আমি তো আছি। আমি দু-তিনটা নার্সিং হোমে যুক্ত আছি, কোথাও একটা বেডের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোকে ফোন করতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করে তোকে ফোন করব। তারপর তুই ওনাকে Refered discharge করাবি।

বোধ হয় ৭ মিনিট বাদে স্যার ফোন করলেন। এই সময়টা আমাদের কাছে ৭ ঘণ্টা বলে মনে হলো। তারমধ্যে কাকাদের নানা রকম সাজেশান। কিছুই কান দিয়ে মাথায় পৌঁছচ্ছে না। তারা অকৃপণ ভাবে সাজেশানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। অবশেষে স্যার ফোনে বললেন যে আমি যেহেতু জীবনতরীতে বেশিক্ষণ থাকি তাই ওখানেই বেডের ব্যবস্থা করেছি। তোদের কি এখানকার অ্যাম্বুলেন্স লাগবে তাহলে বলে দিচ্ছি। আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ লাগবে। কারণ রাত্রি হয়ে গেছে। কোথায় পাবো ঠিক নাই।

—ঠিক আছে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে চলে আয়।

আমি ঠিক করলাম যেমন করেই হোক যত রাত্রি হোক আজই সিফ্ট করতে করাতে হবে। কারণ আগমীকাল পাড়ায় জানাজানি হবে আর আমাদের গৃহবন্দি করে দেবে। বেরোতে দেবে না। আমার জেঠুর ছেলে দাদাকে ফোন করলাম। এক কথায় দাদা বলল যে আমি স্বপ্নলোকে পৌঁছচ্ছি। ছোট কাকা বলল যে ঠিক আছে আমিও যাচ্ছি।

রাত্রি সাড়ে ১১টায় জীবনতরীতে ভর্তি করে সাড়ে ১২টা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। ছোটকাকা তো এলই না, একটা ফোন করেও জানালো না যে পারছি না। আমার মনে পড়ে গেল যেদিন বাবাকে স্বপ্নলোকে ভর্তি করেছিলাম সেদিনও ফোনে ছোট কাকাকে বলেছিলাম তুমি কি বাড়িতে আছো? তাহলে বাবার সুগারের ওষুধগুলো এরা চাইছেন তুমি দিয়ে যেতে পারবে। ছোট কাকা বলেছিল, হ্যাঁ একটু বাদে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আসেনি। অগত্যা সঙ্ঘের একজন কার্যকর্তাকে পাঠালাম। সেই বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে পৌঁছালো।

জীবনতরী থেকে ফেরার সময় দাদাকে সেদিনের ঘটনাটা বলেছিলাম। মনে একটা শান্তি অনুভব হচ্ছে যে এরপর আমাদের উপর যা টর্চার হবে হোক কিন্তু বাবার একটা বড়ো সেটআপে চিকিৎসার সুযোগ হয়ে গেলো। পরের দিন তখনো পাড়ার কেউ জানে না। সেই জন্য নার্সিংহোম থেকে ফোন আসাতে ছুটলাম।

অফিসিয়াল কিছু কাজ বাকি ছিল, শেষ করে যখন বেরোচ্ছি তখন স্যারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। বলল তোমার বাবাকে দেখলাম। Lung এ Ingury আছে, তবে কেস মোডারেট। ঠিক হয়ে যাবে। বাবাকে দেখবে নাকি? লোভ সামলাতে পারলাম না। স্যার সঙ্গে করে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করালেন। বাবাকে দেখে মন অনেক শান্ত হলো।

পরেরদিন প্রথম ভারত সরকারের আয়ুশ মন্ত্রালয় থেকে ফোন এলো যে বাবার করোনা পজিটিভ। তারপর কলকাতা পৌরসভা। এবার তড়িঘড়ি পাড়ায় ব্যবস্থা আরম্ভ হয়ে গেলো। মনে হলো যেন পাকিস্তানের এক দুর্ধর্ষ জঙ্গি এই বাড়িতে ঢুকেছে। বাড়িটা আটকাও। প্রথমে হুমকি তোমাদেরও টেস্ট করাতে হবে। শুরু হলো আমাদের উপর পাড়ার লোকেদের নজরদারি। প্রথম যেটা হলো বাড়ির কাজের সহায়ককে বারণ করে দেওয়া হলো। পাশের বাড়ির কাকিমা রোজ দুবেলা জানালা দিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করত, কিন্তু আজ থেকে দরজা জানালা বন্ধ। মনে হয় জানালা দিয়ে করোনা ঢুকে পড়বে।

শুনলাম কাল পৌরসভাতে টেস্ট ক্যাম্প হচ্ছে। পাড়ার এক বন্ধু বলল যে তোরা এখান থেকে টেস্ট করালেই ভালো হবে। পরের দিন পৌরসভা থেকে লোক এলো দুটো পলিপ্যাক নিয়ে। একটায় মাস্ক, গ্লাভস রাখতে হবে, অন্যটায় আনাজের খোসা ও অন্যান্য জঞ্জাল রাখতে হবে। প্রথমটা এককেজি ৫০০ টাকা প্লাস জিএসটি ১৮ শতাংশ এবং পরেরটা প্রতি কেজি ৫০ টাকা প্লাস জিএসসি ১৮ শতাংশ দিতে হবে। মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নাই। টেস্ট করালাম মা ও আমি। ওখান থেকে বলা হলো যে একজন আত্মীয়ের ফোন নম্বর দিতে যার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করবে। আমি ছোটকাকাকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নম্বর দেবো? ছোটোকাকা সঙ্গে সঙ্গে না বলল। এবার সঙ্ঘের কার্যকর্তা এগিয়ে এসে বলল আমার নম্বর দিয়ে দে। আমি বুঝে নেবো।

হঠাৎ আমাদের সিল করে দিতে আতান্তরে পড়লাম। মাসের প্রথম, বাজার নাই, খাবো কী? বাবার পরিচিত সঙ্ঘের এক কার্যকর্তা বন্ধুকে বললাম। তিনি নিজের পয়সায় বাজার, তরিতরকারি সব কিনে দিয়ে গেলেন। তখন উনার ছেলের জ্বর তা সত্ত্বেও তিনি এ বিপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সত্যি, অবাক লাগে সঙ্ঘ ১ ঘণ্টার শাখায় কেমন করে এই মানসিকতার জন্ম দেয়। যখন আমার আত্মীয়স্বজন ভয়ে অন্যদিকে ছুটছেন, যখন পাড়ার লোকেরা আমাদের বয়কট করছে ,তখন এই স্বয়ংসেবকরা নিজের ও নিজের পরিবারের কথা চিন্তা না করে আমাদের মতো দুর্গতদের পাশে এসে দাড়িয়েছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাবা হাসপাতালে লড়াই করে চলেছেন। দুরূহ শ্বাসকষ্টের মধ্যেও আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। আমি চোখের জল লুকিয়ে কান্না চেপে রেখে কৃত্রিম হেসে বাবাকে বলছি আমরা ভালো আছি। আমাদের আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে পাড়ার লোকেরা আমাদের মহা অপরাধীর চোখে দেখছে। যেন আমরা মধ্যযুগের সেই অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ, যাদের ছায়া মাড়ালে জাত যাবে। আসলে করোনা সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই মানুষকে আরও নির্দয় করে তুলেছে। যতই প্রচার হোক রোগের বিরুদ্ধে লড়তে হবে রোগীর বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু বাস্তবে রোগী তো ছেড়েই দিলাম তার পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে। বাবার এক বন্ধু সূর্যকাকা গত এক সপ্তাহ আগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। সেদিন ওদের খবর নেবো বলে ফোন করলাম। কাকিমা কেমন আছেন? ওনাদের একমাত্র সন্তান মেয়ে ফোন ধরল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল কাকা কেমন আছে? আমি বললাম বাবার শ্বাসকষ্টটা আরও বেড়েছে, অক্সিজেন চলছে। মেয়েটি যাদবপুরে মাস্টারস্ করছে। আমাকে বলল— মনে হচ্ছে আঙ্কেল তোমাদের আরও ভোগাবে। সেক্ষেত্রে বাবা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে যে হাসপাতালে মারা গেছে। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল যে আপনারা কি বডি দেখবেন? আমরা কেউ যাইনি। বলে দিয়েছি যে কেউ যাবে না। আপনারা আপনাদের নিয়ম অনুসারে কাজ করে নিন। সেইজন্যই পাড়াতে আমরা অচ্ছুত নই। অপঘাতে মৃত্যুর বিধান নিয়ে তিনদিনে গঙ্গায় গিয়ে কাজ করে নিয়েছি।

কোনোক্রমে হ্যাঁ হ্যাঁ করে ফোনটা রাখলাম। আমি অশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজের বাবার প্রতি ওর মনোভাব দেখে। আমার খুব ভালো মনে আছে যে ২০১৭ তে মেয়েটির ডেঙ্গু হয়েছিল। তখন সূর্যকাকু বাবার কাছে এসে কী কান্নাকাটি। আমার বাবা যোগাযোগ করে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করালো। কাকুতো বাড়ি আসতেন না। ওখানেই নীচে বসে থাকতেন। বাবা গিয়ে ওনাকে সঙ্গ দিতেন। দুবেলা ওখানে হোটেলে খেতেন। তিনদিন বাদে যখন মেয়ের প্লেটলেটটা বাড়তে আরম্ভ করল সেদিন বাবা অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছিল কাকুকে। আজ তাঁর সেই মেয়ের এই মনোভাব আমাকে যেন আরও বেশি করে আমার বাবাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করল। বাবার ওই লড়াইয়ের কথা মনে পড়তে চোখ জলে ভিজে উঠল। এগুলি দেখেই মনে হয় মানুষ বোধ হয় পরিবেশের দাস।

আমার এক সহপাঠী শিবব্রত হাজরা। পাঁচ বছর ধরে পাইকপাড়ায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে পড়াশোনা করছিল। একই সঙ্গে থাকার সুবাদে বাড়িওয়ালার বিপদে আপদে সবেতেই পাশে থাকত। ওদের পরিবারের কারো শরীর খারাপ হতো হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা করানো থেকে আরম্ভ করে বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিত। কথায় কথায় বাড়ির মালিক সবাইকে বলতেন এটি আমার এক ছেলে। এহেন মালিক একদিন তাকে নোটিশ দিয়ে দিল যে তোমাকে ঘর ছাড়তে হবে। অপরাধ একটা তুমি হাসপাতালের ডাক্তার। করোনা নিয়ে ঘরে আসতে পারো।

সেদিন খবরে শুনছিলাম যে হাওড়ায় একজন মহিলা ব্যাঙ্ক কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার বলেছেন বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করা যাবে। কোয়ারন্টাইনে থাকুন। কিন্তু পাড়ার লোকেরা শুনবে কেন? তাকে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য হুমকি, পরে বাঁশ দিয়ে পেটালো রোগীকে। আমি পড়েছি যে প্লেগ মহামারীর সময় রোগীকে ফেলে রেখে পরিবারের লোকেরা পালিয়ে যেত। সেই সমস্ত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতেন ভগিনী নিবেদিতা। সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে আমাদের এই আত্মসর্বস্ব লোকেদের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন, মার খেয়েছেন, তবু তাদের ফেলে যাওয়া আত্মীয়দের সেবা করেছেন। এই মানসিকতা কোথায় পাওয়া যাবে? এরই উত্তরসূরী বলতে গেলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। তারা এই মন্ত্রে বিশ্বাসী যে ‘একান্তে সাধনা—লোকান্তে সেবা।’

যেদিন আমি ডাক্তারি পাশ করলাম সেদিন বাবা আমাকে বলেছিলেন যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের সেবা করতে হবে তবেই তোমার ডাক্তার হওয়া সার্থক হবে। কারণ রোগীরাই তোমাকে আত্মীয় বলে মনে করবে। একদিন হয়তো এই দুর্যোগ কেটে যাবে কিন্তু আমি আমার নিজের লোকদের চিনে নিয়েছি — স্বয়ংসেবকরাই আমার পরমাত্মীয়। ▌

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সরকার থাকার খেসারত রাজ্যবাসীকে দিতে হচ্ছে

আপাত তুচ্ছ ঘটনা যা অনেকেরই নজর এড়িয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতের জন্য তা বড়োসড়ো অশনিসংকেত ডেকে আনার সম্ভাবনাময়। বিগত এক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন কলেজগুলিতে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত ও অতিথি শিক্ষকদের সরকারের নির্ধারিত (State Aided College Teachers) কলেজগুলিতে পড়ানো ও বেতন সংক্রান্ত নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ব্যবস্থায় সরকার সমস্ত আংশিক সময়ের ও অতিথি শিক্ষকদের ইতিমধ্যেই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নিয়োগকে নির্দিষ্ট অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আইনানুগ ও নিয়মাধীন করেছে।

গবেষক ছাত্র ও শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত অনেকেই সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিগত কিছু বছর ধরে রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূলের যে সমস্ত ধামাধরা শিক্ষক কেবলমাত্র রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতেই ইউজিসি-র নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে কেবলমাত্র অস্থায়ী প্রথায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের এইভাবে কেন্দ্রীয় নির্দেশাবলী উপেক্ষা করে স্থায়ীকরণ আদৌ কাম্য নয়। এর পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গের ইতিমধ্যেই ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ধসে পড়বে। তাঁদের মতে এই এসএসিটি-র প্রথা বলবৎ থাকলে যে সমস্ত স্নাতকোত্তর গবেষক নিষ্ঠাভরে তাঁদের গবেষণার কাজ চালাচ্ছেন বা অনেকেই যাঁরা এম ফিল বা পিএইচডি করে ফেলেছেন, এমনকী যাঁরা কলেজ শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট Net বা Set পরীক্ষাতেও সফল হয়েছেন তাঁদের জন্যও বস্তুত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার হাল্কা সবুজ শার্ট পরিহিত মূল পুলিশবাহিনীর যে 'সহকারী দল' সিভিক পুলিশ নিয়োগের প্রথা চালু করেছে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনি 'সিভিক লেকচারার' তৈরির এই রাস্তা বের করেছে। আমার ধারণায় আগামী নির্বাচনের সময় এই লেকচারারদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো হবে। তাঁরা বিভিন্ন নির্বাচনী বুথে সরকারি তরফে ভোট পরিচালনার দায়িত্ব পাবেন। এখন অনুমান, ক'জন পোলিং অফিসার হিসেবে কাজ করার সময় তারা কি তাদের স্থায়ী চাকরি দেওয়া নিয়োগ কর্তার স্বার্থের কথা ভাববে না?

এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তগুলি শুধুমাত্র মর্জিমাফিক নেওয়া। অবশ্য এর চেয়েও রহস্যময় শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় ক্ষমতাধারী ইউজিসি-র ভূমিকা। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রতিবাদপত্র দেওয়া, সংসদে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার কোনো কিছুই শিক্ষা নিয়ামক সংস্থাকে টলাতে পারেনি। তারা এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। শুধু তাই নয়, এই মর্মে মামলা রুজু হলে কলকাতা হাইকোর্টে (মামলা এখনও চলছে) ইউজিসি কর্তৃপক্ষের তরফে এসএসিটি যে তাদের নিয়ম ও শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছে এ বিষয়ে কোনো বিরোধিতা না করে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করেছে। এর মাধ্যমে এমনটাই যেন প্রতীয়মান হচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার বিষয়টা তাদের বিচার্যের মধ্যে পড়ে না।

অবশ্য, জাতীয় প্রেক্ষাপটে এই এসএসিটি এবং তার কাজের পরিধি ও ধারা যদিও তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। সারা দেশের উচ্চশিক্ষার ওপর এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও এই ক্ষুদ্র বীজাণুর অন্য ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে এটাই বোঝা যায় দেশব্যাপী কেন্দ্র তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজস্ব নীতি ও কার্যপ্রণালী প্রয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

অন্যদিকে, দিল্লি ও অন্যান্য অঞ্চলের বেশ কিছু নেতা নরেন্দ্র মোদীর নিজস্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সমালোচনায় মুখর হয়ে তাঁর নীতিকেই বানচাল করে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। অথচ নরেন্দ্র মোদীর গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা পর্যালোচনা করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটটি প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এই রাজ্যটির বৈশিষ্ট্য হলো সেই ১৯৭৭ সাল থেকে আজ অবধি এখানে যে রাজ্যসরকারগুলি ক্ষমতাসীন থেকেছে রাজনীতিগতভাবে তারা সকলেই কেন্দ্রের বিপরীত মেরুর। এই অতি দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক বিরুদ্ধ পরিবেশ যেখানে এই বিরুদ্ধাচরণ চরম কুশ্রীতায় পর্যবসিত হতেও দেখা গেছে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক স্তরে রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত প্রহরার বিষয় থেকে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণের মতো ক্ষেত্রেও দিল্লি ও কলকাতা পূর্ণ সংহতি রেখে কাজ করেছে এমন উদাহরণ বিরল। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি থেকে রাজ্যকে পাঠানো প্রয়োজনীয় নানা বিষয় সংক্রান্ত চিঠিগুলির উত্তর না দেওয়া নিয়মে পরিণত করা হয়েছে। কেন্দ্র থেকে জারি করা বিভিন্ন নির্দেশাবলীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা আজ এমন স্তরে পৌঁছেছে যেখানে মনে হয় দিল্লিকে হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে।

ধরুন, 'আয়ুষ্মান ভারত', 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' বা আলোচ্য ইউজিসি-র নিয়মাবলীর পালন সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতেই কোনো সাধারণ ঐকমত্যের সম্ভাবনাই দেখা যায়নি। এইগুলির অস্তিত্বই যেন উবে গেছে। অনেকেই হয়তো জানেন বিগত ৪০ বছর ধরে রাজ্য থেকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব পাওয়ার জন্য বিশিষ্ট কোনো মানুষদের নাম মনোনীত করে পাঠানো পর্যন্ত হয় না। অথচ মমতা ব্যানার্জি রাজ্যে বিশিষ্টদের সম্মানিত করার একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা মোতায়েন করেছেন। যেখানে সীমান্ত প্রহরা নিয়েই বিতর্ক উঠতে পারে সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান তো তুচ্ছ।

এই ধরনের অস্বীকার ও উপেক্ষার প্রবহমান

প্রবণতার ফলে বহু ক্ষেত্রেই কেন্দ্রকে অসহায় ও নিরুপায় পরিস্থিতির সামনে পড়তে হচ্ছে। কেননা অজস্র কেন্দ্রীয় জনহিতকর প্রকল্পেরই সর্বশেষ কার্যকরী এজেন্ট তো রাজ্যই। সেই তো মাধ্যম যে পথে প্রকল্প রূপায়িত হবে। রাজ্যটিতো দেশের বাইরে নয়। এই অসহযোগিতার ভয়াবহ পরিণতি দেখা গিয়েছে বহু পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের থমকে যাওয়াতে। বহু প্রকল্প দিনের আলো দেখার আগেই অপমৃত্যুর মুখে পড়েছে। তবুও রাজ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরাসরি কেন্দ্র পরিচালিত যেখানে উল্লেখিত প্রত্যক্ষ অবহেলা করার পথ না থাকলেও অসহযোগিতার কোনো বিরাম নেই। সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে একটা বিক্ষুব্ধ, মারমুখী পরিবেশ তৈরি করা হয়। কেন্দ্রের প্রথা প্রকরণগুলিকে বিবিধ বাধার সম্মুখীন করে এক ধরনের নীরব গুরুত্বহীনতার শিকার হতে হয়। প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা যেখানে এক ধরনের হতাশাগ্রস্ত অস্বস্তিকর পরিবেশের মুখোমুখি হন। জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় জাদুঘর (মিউজিয়াম) এই আচরণের বলি। প্রতিষ্ঠানগুলি জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যায় জর্জরিত। আর একটি বড়ো উদাহরণ কলকাতা বন্দর। এটির কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় মস্তান দাদাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কলকাতা বিমানবন্দরের দীর্ঘদিন ধরে উন্নতির অপেক্ষায় থাকা রানওয়ে-র মেরামতি আটকে রয়েছে। এর কারণ উড়ান পথের মধ্যে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত কাছের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি ছোটো প্রার্থনাস্থল।

ওই উপাসনাস্থলে হাত দিলে সংখ্যালঘু শ্রেণীর সংবেদনশীলতায় আঘাত লাগা ও তজ্জনিত কারণে তাদের ভোট সরে যাওয়ার ভয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকারে লাগা বিমানবন্দরের উন্নয়নের কাজ ঝুলে আছে। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী একটি ব্যতিক্রম। সেখানে এই অন্যায্য দাপট নেই, কেননা সেখানকার আচার্য প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠানও দীর্ঘদিন অন্তর্কলহ ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। যার পরিণতিতে এক পূর্বতন উপাচার্যকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর জেল পর্যন্ত খাটতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একটি পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্পন্ন ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সংহতি ও পারস্পরিক বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হওয়া জরুরি। এর অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কথার কথাই থেকে যাবে। অকেজো হয়ে পড়বে। এই সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সজীব রাখতে কী কী করা উচিত নয় তা অনুধাবন করতে পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ প্রকৃষ্ট।

(লেখক রাজ্যসভার সদস্য ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

শোক সংবাদ

মালদা নগরের রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকা তথা সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্যা শ্রীমতী সোনালি কুণ্ডুর মাতৃদেবী সন্ন্যাসিনী গায়ত্রী

পুরী গত ২৬ জুলাই সাধনোচিত ধামে গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। উল্লেখ্য, তিনি মালদা নগরের মাধব নগরের শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকতেন। আশ্রমেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১ পুত্র, ১ কন্যা, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য ভক্তজন রেখে গেছেন।

A Historical Journey Since 1940

GODAVARI COMMODITIES LTD.

(Bhutoria Group of Company)

SINGLE SOLUTION ORGANISATION ON COAL

Business Interests :

Coal Handling * Trading of Coal * Mine Outsourcing * Mining of Coal * Consultancy of Coal Mining * Real Estate * Finance

18, N. S. Road, 2nd Floor, Kolkata- 700 001
Phone : +91-33-2242 6134/8972
Fax : +91-33-2242 6160
Email : imbgodavari2@gmail.com

Assansol, Durgapur, Andal, Ranigunj, Dhanbad, Ranchi, Ramgarh, Khelari, Singroli, Korba, Nagpur, Brijrajnagar, Talchar

জওহরলাল নেহরু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সময়ে সংঘটিত নানান সমস্যার এক অন্যতম উদাহরণ— অসম সমস্যা। ১৯৬০-৬১ সালের সেই দাঙ্গায় বাঙ্গালিদের প্রতি অসমীয়দের আমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার এবং মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় তরুণ-তরুণীর মৃত্যুর কথা আমাদের জানা। সেই দাঙ্গার স্মৃতিচারণা সূত্রে তারাশঙ্কর বলেছেন—

"সেদিন কোনো একটি সংবাদপত্রে এই বাঙ্গালি নিধন বা নির্যাতন আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং এর জন্য দায়ী করতে গিয়ে দায়ী করেছিলেন অসমের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলকেই— সে কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী থেকে সব দলকেই। কমিউনিস্টদের নাম তো ছিলই। তাঁর সঙ্গে আরএসপি-র নামও করেছিলেন। কিন্তু গৌহাটি শিলংয়ে নিজে গিয়েছি এবং ওখানাকার কর্মীদের সঙ্গে আলাপের সূত্রে যা জানতাম বা জানি তাতে অসমে আরএসপি খুব সবল বা সক্রিয় নয়। সক্রিয় আরএসপিআই, এঁদের গৌহাটি গ্রুপের উৎসাহী কর্মীটিকেও আমি চিনি। তিনি ওখানকার তরুণ উকিল।"

সেই দাঙ্গার প্রভাবে কলকাতাও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র শহর জুড়ে চাপা উত্তেজনা তখন থমথম করছে। অসমীয় ছাড়াও অন্যান্য অবাঙ্গালিদের মধ্যেও তখন আতঙ্ক। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়— বাংলাদেশকে অবাঙ্গালি মুক্ত করতে হবে। অসমীয়দের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রতিবাদ সভা ডাকা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। তারাশঙ্কর ছিলেন সেই সভার সভাপতি।

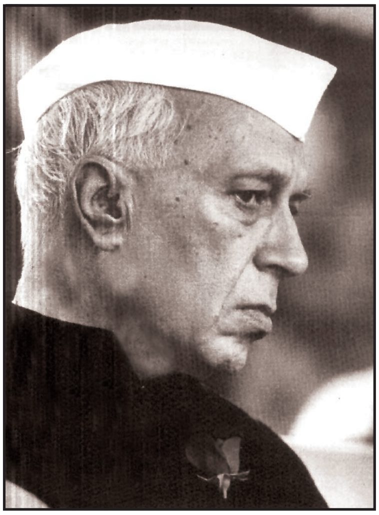

সভায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। মঞ্চে নেতাদের ভিড়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মনোজ বসু, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রিদিব চৌধুরি, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মন্মথকুমার চৌধুরি, অসমের নেতা স্বর্গীয় অরুণ চন্দ'র পত্নী জ্যোৎস্না চন্দ প্রমুখ। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন— পত্রিকা বাড়ির প্রফুল্লকান্তি বা শতদলকান্তি ঘোষ। এছাড়া কোনো কংগ্রেস নেতা বা কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নেতা সভায় উপস্থিত ছিলেন না। সভার কাজ আরম্ভ হয়েছিল বরিশালের মুকুন্দদাস রচিত একটি গান দিয়ে। সে গানেও ছিল অগ্নিযুগের উত্তেজনা। সভার উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল এবং হিংস্র চেহারা দেখে তারাশঙ্কর সভা আরম্ভের প্রারম্ভেই প্রচলিত নিয়ম অর্থাৎ সভাপতির বক্তব্য সর্বশেষে দেওয়ার নিয়মটি লঙ্ঘন করে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন— "আমাদের এই প্রতিবাদ যেন আমাদের বাঙ্গালির জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের গৌরব এবং মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে। আমরা যেন রাজা রামমোহন রায়, থেকে বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ এবং মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মনে রেখে আজ এই সভায় আমাদের দুঃসহ দুঃখ ক্ষোভকে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করি। একের অন্যায়ে তার জ্ঞাতি বা আত্মীয়কে নির্যাতিত না করি।... সভা এতে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাতে আমি হাতজোড় করে বলেছিলাম, তাহলে আমাকে আপনারা মার্জনা করুন। এ সভায় সভাপতিত্ব করতে আমি পারব না। কারণ সংসারে বর্বরতার প্রতিবাদে বর্বর হব এই সংকল্প গ্রহণ করে ঘোষণা করবার জন্য কোনো সভা সমিতির প্রয়োজন হয় না।"

তারাশঙ্করের বক্তব্যের ব্যঞ্জনা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিল সভার উপর। উত্তেজিত জনতা মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর বিবেকানন্দবাবুর বক্তৃতায় সভা আবার জ্বলে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, "সভাপতি যা বলেছেন এবং সৌমেনবাবু যা বলেছেন তা অবশ্যই ভালো কথা— কিন্তু শিক্ষা ঠিক ভারতীয় নয়। আমার শিক্ষা মহাভারতের শিক্ষা। আমার শিক্ষা--- দ্রৌপদীর অপমানে দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করতে বলে ভীমকে। কৌরবদের সবংশে নিধন করতে বলে"। বিবেকানন্দবাবুর বক্তৃতায় সভায় উপস্থিত মানুষের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। কলরব

কোলাহলে পাগলের প্রমত্তপনা শুরু হয়। হাত-পা ছুঁড়ে শাসনের আস্ফালন শুরু হয়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল তারাশঙ্কর। জ্যোৎস্না চন্দ হাতজোড় করে বলেন— ‘‘আপনারা এখানে ধৈর্য হারিয়ে এখানকার অসমীয় বা অবাঙ্গালির উপর অত্যচার করলে অসমে আমরা আরও অধিক পরিমাণে বিপন্ন হব’’। উত্তেজিত সভায় হইচই করে তাঁকে বলতে দেওয়া হয় না— রূঢ়তম বাক্যে থামিয়ে দেওয়া হয় তাঁর কথা। এই ভাবেই পুরো আড়াই ঘণ্টা ক্ষোভ প্রকাশের কোলাহলে এবং ঘুষি আস্ফালনের দৃশ্যের মধ্যে তারাশঙ্কর অপরাধীর মতো সভাপতির আসনে বসেছিলেন। আড়াই ঘণ্টার পর সভা শেষ হয় কিন্তু কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয় না, এমনকী যাঁরা অসমে মারা গেছেন এবং লাঞ্ছিতা হয়েছেন তাঁদের জন্য কোনো সমবেদনাও প্রকাশ করা হয় না। মানসিক আঘাতে জর্জরিত তারাশঙ্কর উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে চিকিৎসকের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হলেন, তথাপি চলতি ভাবতরঙ্গ বা হুজুগে নীরব থাকতে পারলেন না। পত্রমাধ্যম বা চিঠি লিখে তিনি সেই মর্মান্তিক ঘটনার অবসানে নীতির পথে অগ্রসর হলেন।

২১ মে ১৯৬১ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে পরামর্শমূলক এক চিঠিতে তারাশঙ্কর লেখেন—

‘‘I am sure, that this tremendous but well founded faith of the people in you must be honored at all costs to ensure the stability, security and prosperity of a growing community of four hundred sixty million men and women. This is a great responsibility but you have seldom been found wanting to fulfill it.

The Silchar firing on Satyagrahis resultin in the death of nine (until today) including a teen-ager girl has reopened the wound which, so many of us wishfully thought, was healing. The eagerness of the state Government to maintain of law and order in the present case, so violently in contrast with their lasses-faire attitude last year, gives much support to the contention that State Government is determined in fragrant defiance of all ethical and patriotic principles to liquidate all democratic opposition to their linguistic chauvinism. Must this continue without opposition indefinitely? Is the autonomy of the State so much stronger than the balanving authority of the centre? Many like me are seeking anseers to these questions in bewilderment. I again approach you with my doubts and misgivings and very respectfully suggest that there sould be an open announcement at your level of the concrete measures that are proposed to be taken to redress the grievances of all sections of the minoritis in Assam and to prevent outrages be the majority and the State Govt. It also necessary to announce the ways and means of carrying out these assurances.

কেবলমাত্র পরার্শই নয়, নেহরুজীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিলম্বে একেবারে সরাসরি কৈফিয়ত তলব করে বাংলায় লেখা এবং ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত একটি চিঠিতে তারাশঙ্কর লেখেন—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ নেহরুজী,

এই পত্র অসুস্থ শরীরে রোগশয্যা হইতে আপনাকে লিখিতেছি। চিকিৎসক সকল প্রকার মানসিক চিন্তা উৎকণ্ঠা আবেগ পরিহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তার পারেন যাঁহারা তাঁহারা যে স্তরের মানুষ আমি তাহা নই। অসমে নির্যাতিত বাঙ্গালি সমাজের জন্য উৎকণ্ঠায় সমগ্র বাঙ্গালি জাতির সহিত আমিও হৃদয়াবেগে পীড়িত। তাহা স্বংবরণের সাধ্য আমার নাই। আপনি স্বকীয় মানবিকতার আহ্বানে কর্তব্যের নির্দেশে অসম স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়াছেন। আমিও ওই মর্মে আপনাকে যে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তাহাও ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ভারতবর্ষের ন্যায়বোধে দৃঢ়তা, সততা ও সাহসের আশ্রয়স্থল কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের মতো অসংখ্য মানুষের সমর্থনে তাহা আজ বিশ্ববন্দিত। তাই আপনি অসমের জনসভায় যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তাহা অসুস্থ রুগ্ন অবস্থাতেও সযত্নে শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়াছি, বুঝিতে চাহিয়াছি। শুধু আমি নই— সমস্ত বাঙ্গালি জাতিই চাহিয়াছে। আপনি পূর্বে কলিকাতার জনসমাজের আবেগ-প্রবণতার সমালোচনা করিয়াছেন— সেই জনসমাজ কী অসীম ধৈর্যে ও সংযমের সহিত শোকদিবস পালন করিয়াছে তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। আপনি অসম যাইতেছেন— এটাই ছিল এক্ষেত্রে বাঙ্গালির বড়ো প্রত্যাশা। আপনি অসমের জনসভায় বলিয়াছেন— কংগ্রেস কর্মীদের কর্তব্য কর্মীরা যথোপযুক্তভাবে পালন করেন নাই, তাহাতে কর্মীরা গুঞ্জন তুলিয়াছে। তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। মনে মনে বলিয়াছি— মানুষের স্বার্থান্ধতা যখন স্থির মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ এবং বিবেকের বাণীতে উগ্র হইয়া প্রতিবাদ তোলে তখন মানুষের যে আত্মিক সর্বনাশ হয়, অসম কংগ্রেসের তাহাই ঘটিয়াছে। কারণ আপনি আজও কংগ্রেসের স্থির মস্তিষ্ক স্বরূপ। তাহার বিবেক বাণী আপনার কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষ— একবার ধর্মবিদ্বেষ... (ছিন্ন) খণ্ডিত হইয়াছে, আবার ভাষা-বিদ্বেষের বিষময় ছুরিকা সুত্রপাত অসমে অসমীয়রা টানিলেন তাহাতে সেই সূত্র বিরাট ফাটলে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষকে কত খণ্ডে কত মর্মান্তিক কলহে দীর্ণ করিবে তাহা সংবিধান সম্মত চৌদ্দটি ভাষার সূচি অনুযায়ী চৌদ্দটি কলহেই শেষ হইবে না।

আপনি বলিয়াছেন— অসমে অসমীয় ভাষাই প্রাদেশিক ভাষা হওয়া উচিত। এ কথাও আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিক্ষুব্ধ বিচারপার্থীর মনস্তুষ্টি করিয়া বিচার হয় না মানি, তাহাও আমরা অন্তত আমি বলি না। বি. ...(ছিন্ন) এমআরসি-র প্রস্তাব সম্মুখে রাখিয়া বলি— যে যেখানে অসমীয়া ভাষা শতকরা ৭০ জনের ভাষা হওয়া দূরে থাক—

মাত্র ৪০ জনের ভাষা এবং বাংলা যেখানে অন্তত ২৪-২৮ জনের ভাষা সেখানে তাহা মানি কী করিয়া? এই দশ বৎসরে অসমীয়া ভাষার বৃদ্ধি... (ছিন্ন) একমাত্র জাদুবিদ্যার প্রভাব ব্যতিরেকে এবং জাদুবিদ্যায় যাহা সম্ভব কঠোর বাস্তব বিচারে তাহাকে— তাহা সম্ভবত আদমসুমারির কর্তাদের মন্তব্যেও স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য পরে আপনি বলিয়াছেন, সকল সম্প্রদায় মিলিয়া এ সমস্যার সমাধান করিবেন। এবং ৩১ জুলাই অসমীয়া ছাত্রবৃন্দের সভায়— ভাষা সপ্তাহ কার্য্যকর্ম নির্ণয়ে যদি হিংসাত্মক পন্থা গৃহীত হয় তবে সমস্ত শিক্ষা প্রাথমিকভাবে বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়াছেন। ইহা অবশ্যই আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সাহস দিয়াছে। আপনি অসমে তিন সপ্তাহ সময় দিয়াছেন--- নিরাপত্তা সূচক মনোভাব সৃষ্টি করিয়া নিপীড়িত পলায়িত বাঙ্গালিদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য। কিন্তু তাহা সৃষ্টি হইল কিনা— বাঙ্গালি ফিরল কিনা— নিজেদের নিরাপদ ভাবিল কিনা— কে বলিয়া দিবে? বর্তমান অসম সরকার?

যাহারা এতবড়ো নির্মম অত্যাচারে বাঙ্গালিকে উৎখাত করিতে গিয়া ভারতবর্ষে ভাষা সমস্যা লইয়া ঐক্যকে বিপন্ন করিবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল— তাহার বিচার হইল কই?

তিন সপ্তাহে যদি বাঙ্গালি না ফিরিতে সাহস করে তবে কী বাঙ্গালি দায় হইবে? আজ রোগশয্যায় শুইয়া— সমস্ত চিন্তাকে একত্র করিয়া কূল পাইতেছি না, আপনাকেই প্রশ্ন করিতেছি আমরা কী করিব? তিন সপ্তাহ পর— আপনি কী করিবেন?

ইতি
শ্রদ্ধানত
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬২ সালে তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যসৃষ্টিতে অতুলনীয় অবদানের জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। 'সাহিত্য আকাদেমির ন্যায় 'পদ্মশ্রী' সম্মানও তারাশঙ্করের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু।

নেহরুজীর আমলে আর এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। এই যুদ্ধে বিপর্যয়ের ইতিহাস যেমন রচিত হয় তেনমই দেশজুড়ে গড়ে ওঠে জাতীয় ঐক্য। এ বিষয়ে তারাশঙ্কর বলেন, '' গোটা ভারতবর্ষে যেন আশ্চর্যবেগে কম্পন বয়ে গেল। একটা যেন জাদুর খেলা ঘটে গেল।অসংখ্য রাজনৈতিক দলে বিভক্ত, নানান প্রশ্নে— ভাষার প্রশ্নে, ধর্মের প্রশ্নে, সীমান্তের প্রশ্নে দেশটা যেন এক মুহূর্তে সকল বিবাদ পাশে ঠেলে, সকল প্রশ্নে ধামাচাপা দিয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

পার্লামেন্টে একটা আইন পাশ হয়ে গেল বিশেষ ক্ষমতাবলে। এদেশের অধিবাসী যারা তাদের পক্ষে ভারতের বর্তমান সীমান্তরেখায় সংশয় প্রকাশ করা দেশদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। সংশয় প্রকাশ করার অর্থটার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না। ছিল চীন অথবা ভারতবর্ষকে সমর্থনের প্রশ্ন।

চীন ভারত আক্রমণ করেছে সেজন্য ভারতের গ্রামে-শহরে গড়ে ওঠে প্রতিবাদ সভা। তারাশঙ্করের জন্মস্থান বীরভূমের লাভপুরে প্রতিবাদ সবায় জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর। সেই সভায় তারাশঙ্কর তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, '' কালে কালে যুগে যুগে মহাপ্রকাশ হয় দেশের। বিশেষ করে ভারতবর্ষের, মা ভারতবর্ষের মৃন্ময়ীরূপের মধ্যে চিন্ময়ী ধ্যানস্থ। চিন্ময়ী হলেন মহাশক্তি মহিমার উৎস, মাটি থেকে বেরিয়ে এসে চোখের সামনে দাঁড়ান, মানুষকে জাগান। বলেন, ওঠো জাগো, অন্যায়কে দূর করো। ন্যায়ের জন্য জীবন দাও। অমর হও। আমার পায়ে প্রাণ বলিদান, সর্বস্ব দান করে আমার হাতের অমৃত পাত্র থেকে অমৃত প্রসাদ গ্রহণ কর। চিতোরে একবার এমনই সংকটে মা বলেছিলেন, ম্যাঁয় ভুখা হুঁ। আজ চীনের আক্রমণের সংকটের মধ্যে তেমনই ভাবে মা জেগেছেন।''

চিন্ময়ী ভারতবর্ষের সেই মহাপ্রকাশ সেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেখেছিলেন। পার্লামেন্টে বসে তারাশঙ্কর নিজের কানে শুনেছিলেন নেহরুজীর ভাষণ। বলেছেন, ''সেদিন লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি চোখের সাম্যনে দেখছি বিচিত্র দৃশ্য। ভারতমাতার মুখের ওপর একটা আবরণ ছিল সেটা সরে যাচ্ছ। ভিতর থেকে এবং দিব্যমূর্তিতে মা জাগছেন। আমি দেখছি তাঁর মূর্তি। তাঁর ললাটে বহ্নি, নয়নে বহ্নি, হাতে বরাভয়, খড়্গ ও বর্ম। তিনি বলছেন, পূজা আন্ ওরে পূজা আন্। ধন আন্, মান আন্, প্রাণ আন্। পূজা দে।''

ভারত-চীন যুদ্ধের কিছুদিন পর, ১৯৬৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নেহরু'র তিরোধান ঘটে। তারাশঙ্করের কথায়, '' পণ্ডিতজী মারা গেলেন। লোকে বলে পার্লামেন্টের স্পেশাল সেশনে চীন-ভারত সংঘর্ষ সংকট সম্পর্কে তাঁর যে একটি স্টেটমেন্ট দেবার কথা ছিল, তা নিয়ে চিন্তা করতে করতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি সহ্য করতে পারেননি। সারা ভারতবর্ষ হায় হায় করে উঠেছিল। ভারতবর্ষ, এই মাটির ভারতবর্ষের আত্মা কেঁদেছিল।'' তিরোধানের পর তারাশঙ্করের বক্তব্য ছিল—

''এ মানুষ যে এমন অসাধারণ যার তুলনা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের ইতিহাসে দূরদূরান্তে সন্ধান করেও ঠিক মেলে না। সম্রাট অশোক, হর্ষবর্ধন, সমুদ্রগুপ্ত, ইসলাম শাহির মধ্যে সম্রাট আকবর শাহ সমগ্র ভারতবর্ষকে একগ্রন্থনে গ্রন্থন করে তাঁদের রাজত্বকালে একটি শান্তিসমৃদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতবর্ষের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। যে ভারতবর্ষে সম্রাটের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মৃতিলোকে স্থান পেয়েছে। ইংরেজের আমলের ভারতবর্ষ নিষ্ঠুর শাসনে শাসিত ও একান্তভাবে পীড়িত মানুষের দুঃখের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করেছেন সে ভারতবর্ষে প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীন, সকল প্রকার শাসন ও ত্রাস থেকে মুক্ত, অথচ সারাটি দেশ প্রেমের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিসমষ্টি জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তুচ্ছ বাদবিসংবাদ, বিরোধী রাজনৈতিক প্ররোচনায় কিছু অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তাকে মিথ্যা বা কৃত্রিম বলে প্রতিপন্ন করেছে ভারতবর্ষের জনসমষ্টি এই চীন আক্রমণের সময়। দেশের প্রতি ভারতবাসীর যে আশ্চর্য অনুরাগ ভালোবাসা তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত

থাকবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। এই ভারতবর্ষ পণ্ডিত জওহরলালের সৃষ্টি। এর মূলে যে প্রেম তার উৎস ছিলেন তিনি নিজে। তিনি আপন বিশাল হৃদয়ের ভালোবাসায় ভারতবর্ষের মানুষকে অভিসিক্ত করে দিয়েছিলেন বলেই ভারতবর্ষর প্রতিটি মানুষ তাঁকে প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে ভালোবেসেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিটি ব্যক্তিই ছিল তাঁর কাছে ভারতবর্ষ। একটি ব্যক্তির দুঃখও তাঁকে স্পর্শ করেছে এবং সে দুঃখকে তিনি ভারতবর্ষের দুঃখ ভেবেছেন। তাই ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ।”

জওহরলাল নেহরুর এমন ঐতিহাসিক কৃতিত্বময় আদর্শের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারাশঙ্কর। যা সত্যই তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নেওয়া এবং উচ্চকণ্ঠে তার মহিমা ঘোষণা করা তারাশঙ্করের স্বভাবধর্ম ছিল। কিন্তু বাস্তবিক যা অসত্য এবং আপাত সত্যের অন্তরালবর্তী যে দৃষ্টিকে তাঁর অসত্য বলে মনে হতো তাকে নিরঙ্কুশ কণ্ঠে প্রকাশ করতেও তিনি জড়িতকণ্ঠ হননি কোনোদিনই। ভারত নির্মাণ প্রসঙ্গে নেহরুর ঐতিহাসিক কৃতিত্বময় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও তাঁর পূর্ণতার অভাবের কথাও নির্দ্বিধায় তুলে ধরেন তিনি। বলেছেন—

“১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ভৌগোলিক ভারতের বহু সংগঠন সত্ত্বেও ভারতে মানুষের চরিত্র যে মেরুদণ্ডহীনের মতো ভেঙে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্ফুট। পরিস্ফুট শব্দটি এক্ষেত্রে মৃদু। হিংস্র ভঙ্গিতে দস্তুর প্রকাশে এ কদর্যতা মুখ বাড়িয়ে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। মহাত্মাজীর তিরোধানের পর পণ্ডিত জওহরলালজী প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন ভারত জীবনকে গঠন করতে। তিনি শুধু ভৌগোলিক ভারতবর্ষের সংগঠন করতে সমর্থ হয়েছেন।

অনেক কিছু গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষে, এ অস্বীকার কেউই করবেন না। কিন্তু মানুষের মধ্যে আত্মিক সংগঠনে চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি হয়নি এবং দৃঢ়চরিত্র আদর্শবাদী সমাজেরও সৃষ্টি হয়নি। কারণ গান্ধীজীর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি পণ্ডিতজীর ছিল না— একথা পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেও তাঁর আত্মা প্রণীত হবে না বা তাঁর স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে না।”

জওহরলাল নেহরুর প্রয়াণের পর প্রধানমন্ত্রী হন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তারাশঙ্কর আরও কিছুকাল রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন । তারাশঙ্করের ভাষায়—“সৎ লোক, শান্ত লোক — কিন্তু মৃদু মানুষ। জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দিতে জানেন।” ■

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

বিদ্যাসাগরের আলোকে বর্ধমান

ডাঃ বলরাম পাল

জেলাটির নাম বর্ধমান হলেও, এই বর্ধমান নামটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনমত প্রচলিত আছে। কোনো কোনো মতে, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান এই রাঢ় দেশে পরিভ্রমণে আসায় তাঁকে স্মরণে রাখতে তাঁর নামই এই জনপদের নাম হয় বর্ধমান। আবার অন্য মতে এই জনপদ ক্রমবর্ধমান ছিল বা দ্রুত বর্ধিষ্ণুতার কারণে এই জনপদটিকে বর্ধমান নামে অভিহিত করা হয়। তবে নাম নিয়ে বিতর্ক যাই থাক, একথা স্বীকার করতেই হবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় এই জেলায় শিক্ষা চেতনা সংস্কৃতির এক বর্ধমান প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

বর্ধমানবাসীদের বা বর্ধমান জেলার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগের কথা উঠলে সর্বপ্রথম এই যে জায়গাটার কথা মনে পড়ে সেটা হলো চকদিঘি। অধুনা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার অন্তর্গত চকদিঘি গ্রামে বাস ছিল সিংহরায় পরিবারের। ইতিহাস থেকে জানা যায় আনুমানিক ৩০০ বছর পূর্বে উত্তরপ্রদেশ থেকে বঙ্গপ্রদেশে আসেন সিংহরায় পরিবার। এই চকদিঘি সিংহরায় পরিবারের আদি পুরুষ এবং সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মান সিংহ মোগল আমলে দশ হাজারি মানসবদার রূপে এই স্থানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সিংহরায় পরিবারের পূর্বসূরি বাবু সারদা প্রসাদ সিংহরায় মহাশয়ের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ সখ্যের ইতিহাস চাকদিঘি অঞ্চলে সর্বজনবিদিত। বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণাতেই সারদা প্রসাদ সিংহরায় বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করেন— যেমন বহুবিবাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রসার। চকদিঘিতে যে উচ্চবিদ্যালয় আছে তা বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা বর্তমানে সারদাপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন নামে খ্যাত। চকদিঘির জমিদার পরিবারের বসতবাটীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবার এসেছেন। তাঁর জন্য জলমহলে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল। শোনা যায় একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ হলে চকদিঘির এই সিংহরায় পরিবারের বাগানবাড়িতে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম যাপন করেন। এখানে উল্লেখ্য শুধু বিদ্যাসাগরের নয়, সত্যজিৎ রায় 'ঘরে বাইরে' সিনেমার শ্যুটিং করার সময় বেশ কিছুদিন এই বাড়িতে ছিলেন। বড়লাট কার্জন মাঝেমধ্যেই এই বাড়িতে এসে থাকতেন। এছাড়াও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-সহ বহু গুণীজনের পদার্পণ ঘটেছিল এই বাড়িতে।

বর্ধমানের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের যোগাযোগের আরও একটা ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা হলো প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের সঙ্গে যোগাযোগ। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের কাছ থেকে সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও অলংকার সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তাঁর পূর্ব পাঠের সামগ্রিক পর্যালোচনা করে দিতে, তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। ঈশ্বরচন্দ্রের মনন গঠনে তার স্বজনদের প্রভাব যেমন লক্ষ্য করা যায়, ঠিক তেমনই শিক্ষকদের বিশেষত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের অসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমানের শাঁকনাড়া গ্রামে।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ছিলেন পালি ভাষায় দক্ষ। জেমস প্রিন্সেপের অনুরোধে অশোকের শিলালিপি পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন প্রেমচন্দ্র । তার ফলে এ দেশে লুপ্ত বুদ্ধচেতনা জাগ্রত হয়। প্রেমচন্দ্রের ছাত্র থাকা কালে ঈশ্বরচন্দ্র তার মাতামহীকে দিয়ে বীরসিংহে একটি বোধিবৃক্ষ চারা রোপণ করে আজীবন সেটি সযত্নে রক্ষা করেন। ভারতে আধুনিক শিক্ষার দিশারি ডেভিড হেয়ার এবং প্রাচীন ঐতিহ্য সন্ধানী জেমস প্রিন্সেপ ১৮৪২ সালে মারা যাবার পর প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের প্রিয় দুই ছাত্র ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের উত্তরসূরি হন।

১৮৬৭ সালে বর্ধমানে জ্বর মহামারী আকার নিলে বর্ধমান শহরের মুক্তমনা শিক্ষাবিদ গোলাম জাহেদির বাড়িতে স্বাস্থ্য শিবির স্থাপনার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সূচনা করেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর স্বয়ং গুরুতর অসুস্থ হলে তিনি স্বাস্থ্যচেতনা এবং চিকিৎসা ভাবনায় মগ্ন হন। তিনি ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি, ডাঃ তামিজ খান, ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখের সঙ্গে অ্যালোপাথি নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, ঠিক তেমনই বন্ধু রাজেন্দ্রলাল দত্তকে নিয়ে ডাঃ বেরিনীর কাছে হোমিওপ্যাথিও শিখছেন। বিদেশ থেকে হোমিওপ্যাথি বই আনিয়ে দুজনে একসঙ্গে পড়াশোনা করছেন। এদিকে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (এমডি) ছিলেন ঘোর হোমিওপ্যাথি বিরোধী। তুমুল যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগর ডাঃ সরকারকে হোমিও অনুরাগী করে তোলেন। সে সময়েই চিকিৎসা প্রচলনের অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়।

পরবর্তীকালে বর্ধমানের যোগসূত্রে সাঁওতাল পরগনার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল জব্বারের কাছ থেকে সাঁওতালদের ওপর ব্রিটিশ অত্যাচারের কথা সবিস্তারে জানার পর সেখানে একটি বাড়ির সন্ধান করতে বললে বর্ধমান নিবাসী আব্দুল জব্বারের প্রচেষ্টায় কার্মাটাঁড়ে একটি বাড়ি কেনা হয় এবং সেটির নামকরণ করা হয় নন্দনকানন। বিদ্যাসাগর এই বাড়িতে থেকেই নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য উপেক্ষা করে সাঁওতালদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবিকার জন্য বাকি জীবন উৎসর্গ করেন। উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগরের আলোয় আলোকিত বর্ধমানের আব্দুল জব্বার স্যার আশুতোষের সুপারিশে মুসলমান সমাজের শিক্ষা প্রসারে উজ্জ্বল ভূমিকার জন্য ১৯০৯ সালে নবাব উপাধি পান।

বর্ধমানের বিদ্যাসাগর যোগে আরেকটি নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হলেন জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞান সাধক আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু। আচার্য বসু ১৮৫৩ সালের ২৯ অক্টোবর বর্ধমান জেলার জামালপুর থানায় অবস্থিত বেরুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন উদার প্রকৃতির বিদ্যানুরাগী। তাঁর প্রচেষ্টায় আচার্য গিরিশচন্দ্র ১৮৭৬ সালে হুগলি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ করেন। সে সময়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর উড্রো সাহেব তাকে কটকের রাভেনশ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি এমএ পাশ করেন, অবশ্য তার আগে ১৮৭৭ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে বর্ধমান নিবাসী প্যারীচরণ মিত্রের কন্যা নীরদ মোহিনীর সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বৈবাহিক সূত্রে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আচার্য গিরিশচন্দ্র ১৮৮১ সালে বিদেশ যাত্রা করেন এবং ১৮৮৪ সালে শিক্ষ সমাপন করে দেশে ফিরে আসেন। সে সময় তিনি উচ্চ সরকারি চাকরির উপেক্ষা করে বাঙ্গলায় শিক্ষা বিস্তারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৮৮৫ সালে সরকারের সাহায্য ছাড়াই তিনি বউবাজার স্ট্রিটের একটি ভাড়া বাড়িতে ৬ জন শিক্ষক এবং ১২ জন ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবাসী স্কুল।

দু' বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় ও পরামর্শে এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গবাসী কলেজ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩০ সালে এই কলেজ তার বর্তমান ঠিকানা ১৯ স্কট লেন (বর্তমান নাম, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণি), শিয়ালদহে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গলায় কৃষি শিক্ষা প্রচার ও প্রসার। বঙ্গবাসী কলেজ সারা বাঙ্গলায় প্রথম স্বদেশি কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠা পায়।

ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গলার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি ঈশ্বরচন্দ্রের বিপুল কর্মদ্যোগের আলোকে বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ যখন অলোকিত, বর্ধমান তার ব্যতিক্রম নয়। একই সঙ্গে ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার জনককে প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ করতে থাকা বর্ধমানের কৃতী সন্তানদের অবদানও স্মরণীয়।

With Best Compliments from :

K. Khandelwal and Company

ভ্রাতৃত্বের প্রতীক রাখি

ধীরেন দেবনাথ

বাঙ্গালিদের মধ্যে একটা কথা বহুল প্রচারিত— ‘বারোমাসে তেরো পার্বণ’। সারা বিশ্বে অন্য কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নেই যারা হিন্দুদের মতো বিশেষ বাঙ্গালি হিন্দুদের মতো এত সব উৎসব বা পার্বণ পালন করে। উৎসব প্রিয়তা হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ এমন এক বিচিত্র দেশ সেখানে রয়েছে বহু মত-পথ-ভাষা, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ও উপাসনা পদ্ধতি। তবুও এদেশের হিন্দু সমাজে বিরাজমান বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য। তবে এই ঐক্যকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে হিন্দুত্ব। আর হিন্দুত্বই হচ্ছে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রাণভোমরা। তাই তো কবি অতুলপ্রসাদ লিখেছেন—

“নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।”

সত্যি বলতে কী, ভারতকে আজও ঐক্যবদ্ধ বা অখণ্ড রেখেছে একমাত্র হিন্দুত্ব। তার প্রমাণ ভারতের যে স্থানেই ফাটল ধরেছে বা মানুষের মানসিকতা থেকে ‘হিন্দুত্ব’ বিদায় নিয়েছে, সেই স্থানেই দেখা দিয়েছে ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদ। উদাহরণ : কাশ্মীর, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। রাখিবন্ধন বা রক্ষাবন্ধনও ভারতের অসংখ্য উৎসবের মধ্যে একটি। রাখি মানে রক্ষা। আর বন্ধন মানে বাঁধা। অর্থাৎ রাখিবন্ধন মানে বাঁধনের দ্বারা রক্ষা করা। তাই রাখি হলো রক্ষার প্রতীক বা দ্যোতক। তাইতো এই রক্ষার প্রতীক হিসেবে আমরা বেছে নিই একগাছি রঙিন সুতো। শ্রাবণীপূর্ণিমা তিথিতে আমরা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে তাদের বিপদআপদ থেকে মুক্তি, মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে পবিত্র ও শুভ রাখিবন্ধন উৎসব পালনে ব্রতী হই। তাই এই উৎসব এক প্রকার সামাজিক উৎসবও বটে। তবে এই উৎসবের সূচনা কবে হয়েছে তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ না মিললেও অতি প্রচীনকাল থেকেই যে এই সামাজিক উৎসবটি চলে আসছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে রাখিবন্ধন উৎসবের একটি ধর্মীয় দিকও রয়েছে।

দেব-দেবীর পূজার্চনার সময় মূর্তির সামনে আম্রপল্লব, ডাব-সহ জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করে ঠিক তার চারপাশে দণ্ডায়মান চারটি তিরকাঠিকে পাঁচ বা সাত পাক লালসুতো দিয়ে বন্ধন করা হয় ঘটটির রক্ষার্থে। ওই একই উদ্দেশ্যে কখনো কখনো দেব-দেবীর হাতে বাঁধা হয় রঙিন সুতো। আজও গ্রামে-গঞ্জে ওই একই কারণে বিশেষ তিথিতে অঙ্গবদ্ধ বট-পাকুড়ের পুজো হয়। অনেককেই বৃক্ষযুগলকে রঙিন সুতো দিয়ে বেষ্টন করতে দেখা যায়। আবার কোনো কোনো জাগ্রত দেব-দেবীর মন্দির সংলগ্ন ডালিম, বট, পাকুড়, অশোক ও নিমগাছে বা ডালে কোনো কোনো ভক্ত বাঁধেন লাল তাগা। আর তাঁরা এসব করেন ওই বৃক্ষসমূহের মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে ও দীর্ঘায়ু কামনায়— যাতে ঝড়ঝঞ্ঝার হাত থেকে তারা রক্ষা পায় বা কেউ তাদের অনিষ্ট না করে। পরিবেশপ্রেমীরা যে ‘একটি গাছ একটি প্রাণ’-এর কথা বলেন, তার মূলেও রয়েছে বৃক্ষরক্ষণ। বৃক্ষরোপণ অভিযান বা অরণ্য সপ্তাহ পালনেরও মূল উদ্দেশ্য বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সবুজকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ। কারণ জীবকুল ও বৃক্ষকুল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, যজ্ঞোপবীতধারীরা উপবীত ধারণ করেন শুধু বর্ণ পরিচয়ের নিমিত্তই নয়, দেহ ও মনকে পবিত্র রেখে ধর্ম রক্ষারও স্বার্থে। হাতে বিপত্তারিণীর লালডোর পরার উদ্দেশ্য বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া। তাছাড়া শাস্ত্র-পুরাণাদি, রামায়ণ ও মহাভারতেও রয়েছে রক্ষাবন্ধনের নানা উদাহরণ।

বামন পুরাণে বামন অবতাররূপী বিষ্ণু দানবরাজ বলিকে পাতালে পাঠিয়ে দিলে বলি বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হন। ধ্যানে তুষ্ট বিষ্ণু বলির আলয়ে আশ্রয় নেন। এদিকে পতিবিরহে আকুল বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবী এক ব্রাহ্মণীর বেশে বলির নিবাসে আশ্রয় নিয়ে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে বলির হাতে রাখি বেঁধে দেন। ভবিষ্যপুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবকুলের পরাজয় নিশ্চিত অনুমান করে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের রক্ষার্থে তাঁদের হাতে রাখিবন্ধন করেন। আবার দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত না করতে পেরে তাঁর গুরু বৃহস্পতির শরণ নিলে গুরু ইন্দ্রজায়া শচীদেবীকে একগুচ্ছ মন্ত্রপুত সূত্র প্রদান করেন। শচীদেবী সেই সূত্রগুচ্ছ দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দিলে তিনি যুদ্ধে জয়ী হন। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতাদেবীকে উদ্ধারের নিমিত্ত রাক্ষসরাজ রাবণের বিরুদ্ধে নর-বানরের যুদ্ধে ভক্ত হনুমানের সহায়তায় বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিদর্শনস্বরূপ সুগ্রীব-হনুমান-সহ অন্যান্য বানরদের মণিবন্ধে বেঁধে দেন ফুলডোর। সদ্যোজাত কর্ণের হাতে মা কুন্তীর রক্ষাসূত্র বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া বা শ্রীকৃষ্ণের হাতে মা

যশোদার রঙিনসূত্র বন্ধন— এগুলি সন্তানের মঙ্গল কামনায় রাখিবন্ধন ভিন্ন আর কিছু নয়। এছাড়াও রাখিবন্ধন বিষয়ক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও রয়েছে। মধ্যযুগে নারী তার সন্মান রক্ষার তাগিদে অপরিচিত পুরুষ হলেও তার হাতে রাখী বেঁধে তাকে ধর্মভাই করে নিত। ধর্মভাইও নিজের জীবন তুচ্ছ করে তার ধর্মবোনের সম্ভ্রম রক্ষায় ব্রতী হতো। আবার যুদ্ধযাত্রাকালে মা তার বীরপুত্রের হাতে, বোন তার বীরভ্রাতার হাতে সুরক্ষা, যুদ্ধজয় ও মঙ্গল কামনায় রাখি বেঁধে দিত। একদা চিতোর বাহাদুরশাহ দ্বারা আক্রান্ত হলে চিতোরের মহারানি কর্ণাবতী. মোগল সম্রাট হুমায়ুনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর কাছে রাখি পাঠান। চিতোরের পতন হলে সম্রাটের পৌঁছনোর আগেই রানি জহরব্রত পালন করেন।

রাষ্ট্রহিত তথা দেশাত্মবোধেও রাখিবন্ধন সমভাবে প্রযোজ্য। ভারত শাসক কার্জন সাহেব ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দিলে বাঙ্গলার মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধনের মহত্ত্ব ও ঐক্যভাবের কথা উপলব্ধি করে ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ রদের নিমিত্ত কলকাতার রাজপথে বিশাল শোভাযাত্রা বের করে রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেন। হাজার হাজার জনতা সেদিন রাজপথে নেমে অখণ্ড বঙ্গের দাবিতে সোচ্চার হন। সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় কবিগুরুর সেই জাতীয়তাবাদী দেশাত্মবোধক গানটি—

"বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার বায়ু, বাঙ্গলার ফল।

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।।"

বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। রাখিবন্ধন উৎসব তাই একটি জাতীয় উৎসব। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাই এটিকে সঙ্ঘ উৎসব রূপে গ্রহণ করেছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে মানুষের উন্নয়ন অসম্ভব। তাছাড়া সঙ্ঘ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। সেই সুবাদে সমাজের উন্নয়নই সঙ্ঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৫ সাল থেকেই সঙ্ঘ সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্র জাগরণ করে চলেছে। হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড়ো পাপ অস্পৃশ্যতা, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ, বর্ণবৈষম্য ও ঐক্যহীনতা। এইসব কারণে ভারত বার বার বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এসেছে শক, হুন, পাঠান, মোগল, পোতুগিজ, ইংরেজ । তারা ভারতবর্ষকে প্রায় হাজার বছর ধরে নির্বিচারে শাসন, শোষণ, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুগুলি ধ্বংস করেছে। ফলে ভারতবাসীর মনে জন্ম নিয়েছে বংশানুক্রমিক দাসত্ব, ভীতি ও হীনমন্যতা। তারা হিন্দুত্ব ও হিন্দুস্থানকে ভুলতেই বসেছিল। রাষ্ট্রসাধক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ভারতবাসীর মনোরোগ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আপামর ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকা মানসিক রোগ সারাতে হলে প্রয়োজন মানসিক চিকিৎসা, যা রাজনৈতিক পথে নয়, একমাত্র সম্ভব সমাজ সংগঠনের মাধ্যমে। তাই তো তিনি নাম, যশ, অর্থ ও প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সেবাধর্মী সংগঠন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এর দৈনন্দিন শাখায় শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিকভাবে সংস্কারিত হচ্ছে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষ । সঙ্ঘ হচ্ছে মানুষ নির্মাণের সংগঠন (ম্যান মেকিং অর্গানাইজেশন) এবং শাখা হচ্ছে মানুষ তৈরির কারখানা (ম্যান মেকিং ওয়ার্কসপ)। ১৯২৫ সালে ডাঃ হেডগেওয়ার ভারতের মাটিতে রাষ্ট্র সাধনার যে বীজটি বপণ করেছিলেন সেটি আজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ফুলে, ফলে মহীরূহে পরিণত হয়েছে। মহীরূহরূপী সেই সঙ্ঘ আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক সংগঠন (বিবিসি-র ভাষ্যানুসারে)। তবে বলতে বাধা নেই, আজও সমাজে অস্পৃশ্যতা, বৈষম্য ও জাতিভেদ রয়েই গিয়েছে। এর জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিভেদমূলক তথা জাতপাতের রাজনীতি, দেশাত্মবোধের অভাব ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। সঙ্ঘ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে এইসব অপরাধের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলার প্রয়াস করছে। সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক প্রয়াত বালাসাহেব দেওরসজী বলেছেন, 'অস্পৃশ্যতা পাপ না হলে পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই।'

অস্পৃশ্যতা, ভেদাভেদ ও বর্ণ-বিদ্বেষকে সমাজের শরীর থেকে মুছে ফেলতে রাখিবন্ধনকে সর্বব্যাপী করেছে সঙ্ঘ। রাখির কোনো জাত নেই, বর্ণ নেই, সমাজ নেই। রাখির একটাই ধর্ম ভ্রাতৃত্ব। রাখিবন্ধনের মাধ্যমে তাই তো সঙ্ঘ অবহেলিত, পিছিয়েপড়া, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষ, বনবাসী, গিরিবাসী, ধনী, নির্ধন অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এভাবে ভারতবর্ষে এমন এক ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে চাইছে, যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য। পুরাকালে ভারতীয় সমাজে ভেদ-বৈষম্য, জাতপাত, ছুঁত-অচ্ছুত ইত্যাদি ছিল না। তার প্রমাণ হলো শবরীর দেওয়া ফল শ্রীরামচন্দ্র আহার করেছিলেন, লঙ্কাযুদ্ধে তিনি বনবাসী বানরকুল ও রাক্ষসবংশীয় বিভীষণের বন্ধুত্ব ও সাহায্য নিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের ময়দানে অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবকুল তেমনি মহাবীর ঘটোৎকচও। তাছাড়া শাস্ত্রে তো রয়েছেই— 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (ঈশ্বরের পুত্র সবাই), 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' (পৃথিবীর সবাই আত্মীয়), 'সর্বে ভবন্তুসুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' (সবাই সুখী হোক, সবাই নীরোগ হোক), 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্' (এক সঙ্গে চলো, এক সঙ্গে বলো, সবার মনোবাসনা এক হোক), 'সর্বজন হিতায়' (সবার মঙ্গল হোক) প্রভৃতি অমৃতবচন। তবুও কেন এই বিভেদ-বৈষম্য !

রাখি একগুচ্ছ সুতোমাত্র নয়। এর সঙ্গে মিশে আছে স্নেহ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ভাব— এক ঐক্য, আত্মীয়তার বাঁধন। রাখিবন্ধন উৎসবই পারে মানুষের মন থেকে বৈষম্য দূর করে ঐক্য স্থাপনা করে বিজিগীষু মানসিকতা সৃষ্টি এবং স্বাভিমান জাগ্রত করে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রনির্মাণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে— যা ছিল ডাক্তারজীর স্বপ্ন। যেদিন তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হবে সেদিন সঙ্ঘের রাখিবন্ধন উৎসব পালন হবে সার্থক । সত্যিই আজ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সামাজিক সদ্ভাব ও সমরসতা সৃষ্টিতে রাখিবন্ধন উৎসবের কোনও বিকল্প নেই। তাই রাখিবন্ধনের দিন এই হোক সবার কথা—

মন করেছি, পণ করেছি, আজকে পুণ্য প্রাতে,

ভালোবাসার রঙিন রাখি বাঁধব সবার হাতে। রাখি, বলো রাখি। ■

নেপালি রামায়ণ

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালি ভাষায় লেখা রামায়ণের যে প্রাচীনতম পুঁথিটি পাওয়া গেছে তা ১৮৩৩ সালের। পুঁথিটির নাম 'রাম অশ্বমেধ'।[১] পুঁথিটির লেখক অবশ্য কে তা জানা যায়নি। নেপালি ভাষায় রামায়ণের প্রসঙ্গ উঠলেই সাধারণত আদিকবি ভানুভক্ত আচার্যের নাম স্মরণে আসে।[২] যদিও তাঁরও আগে নেপালিতে রামায়ণ লেখা হয়েছে। সুন্দরানন্দ[৩] ১৮৩৯ সালে 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' লেখেন নেপালি গদ্যে। সমগ্র রামায়ণটি সুন্দরানন্দ ২১৯টি সর্গে বিন্যস্ত করেন। এখানে বলার যে সুন্দরানন্দের রামায়ণ কোনোভাবেই মূল রামায়ণের অনুবাদ নয়। বহু জায়গায় তিনি নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন। বস্তুত তাঁর রামায়ণের উপর পূর্ববর্তী দুইটি সংস্কৃত রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর একটি হলো অধ্যাত্ম রামায়ণ, অপরটি বাল্মীকি রামায়ণ। তাঁর রামায়ণের প্রথম কয়েকটি কাণ্ড তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসরণে লিখেছেন। স্থানে স্থানে নেপলের প্রেক্ষিত ব্যবহার করে তিনি তার রচনার স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।

সুন্দরানন্দ ও আচার্য ভানুভক্তের রামায়ণের রচনার অন্তর্বর্তী সময়ে আমরা রামায়ণের কাব্যানুবাদ পাচ্ছি। অবশ্য নেপালি ভাষায় রচিত হলেও তা প্রকাশ পেয়েছে বারাণসী থেকে। মনে করা হয়, পণ্ডিত রঘুনাথ ভট্টের অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদ ভানুভক্তের রামায়ণের পূর্ববর্তী। ভট্টমশাই বয়েসেও আচার্য ভানুভক্তের চেয়ে কিছুটা বড়ো ছিলেন। যাইহোক, তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে, ভানুভক্তের রামায়ণ প্রকাশের এক বছর পর।

নেপালি সাহিত্যে 'আদিকবি' সম্মানে বিভূষিত ভানুভক্ত আচার্যের জন্ম ১৮১৪ সালে ১৩ জুলাই, মধ্য নেপালের তানুহান (তানুহা) জেলার রামখা বা রামঘা গ্রামে। ভানুভক্তের বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বংশ। তাঁর নিজেরও শিক্ষা হয়েছিল ঠাকুরদা সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের কাছে। বৃদ্ধ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য বারাণসীতে বাস করতেন। সে সময়ে ভানুভক্ত তাঁর ঠাকুরদার সঙ্গেই এখানে থাকতেন। এর ফলে হিন্দুশাস্ত্র, সংস্কৃত ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জনের বিশেষ সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য নিয়মিত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' পাঠ করতেন। এই রামায়ণ ভানুভক্তের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ঠাকুরদা বারাণসীতে দেহ রাখার পর, তিনি যখন নেপালে তাঁর পৈতৃক ভিটেয় ফিরে এলেন, একটি বিষয় তাঁকে বারংবার ভাবিত করতে থাকল। এই ভাবনাটি হলো, এত সুন্দর সুললিত রামায়ণ কাব্যরস তাঁর দেশবাসী আস্বাদন করতে পারছেন না— কেননা তাঁরা সংস্কৃত পাঠে অক্ষম। দ্বিতীয়ত, সাংস্কৃতিক ভাবেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করছেন। এই সমস্যা নিরসনের মানসে তিনি স্থির করলেন, নেপালিভাষায় রামায়ণ রচনা করবেন। নেপালিভাষার প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সুললিত ছন্দে রামায়ণ পরিবেশন করলেন ভানুভক্ত। প্রথমেই লিখলেন 'বাল কাণ্ড'। মাত্র তিরিশ বছর বয়েসে এই 'বাল কাণ্ড' তিনি সম্পূর্ণ করেন। ধীরে ধীরে বাকি কাণ্ডগুলি তিনি শেষ করেন। কবি ভানুভক্ত শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৬৯ সালে। আর তাঁর রামায়ণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। ভানুভক্তের রামায়ণে মোট ১৩১৯টি শ্লোক রয়েছে। তাঁর রামায়ণে বালকাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দর কাণ্ড, যুদ্ধ কাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড— এই সাতটি কাণ্ড রয়েছে।

ভানুভক্তের পরও নেপালিতে রামায়ণ লেখা হয়েছে। এর মধ্যে পণ্ডিত চক্রপাণি চালিসের লেখা 'নেপালি সংক্ষিপ্ত রামায়' উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত চক্রপাণিও বারাণসীতে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করেছেন। এখান থেকে প্রকাশিত দুটি নেপালি পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে, তিনি প্রথম নেপালের জাতীয় সংগীতের কথা লিখেছিলেন। রামায়ণ ছাড়াও সংক্ষিপ্ত মহাভারত, মনুস্মৃতি ইত্যাদি নেপালিভাষায় পরিবেশন করার কৃতিত্বও তাঁর। যাইহোক, পণ্ডিত চক্রপাণির চালিসের রামায়ণ প্রথম প্রকাশ পায় ১৯২৫ সালে। নেপালিভাষায় রামায়ণ রচনার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত ভৈরব সিংহ থাপার 'আত্ম রামায়ণ'। এটিও মূলত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাবপুষ্ট লেখা। যদিও শ্রী থাপা হিন্দিভাষায় রচিত কয়েকটি রামায়ণের সাহায্যও গ্রহণ করেছেন। 'আত্ম রামায়ণ' মূলত রামায়ণ কাহিনির রূপকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অন্বেষণ। এখানে শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানের প্রতীক, সীতা শান্তির, লক্ষ্মণ বিবেক এবং ভরত বৈরাগ্যের প্রতীক।

ভৈরব সিংহ থাপার 'আত্ম রামায়'-র অল্পকাল পূর্বে দুটি উল্লেখযোগ্য রামায়ণ রচিত হয়। এর একটি হলো সোমনাথ সিগদেলের 'আদর্শ রাঘব' (১৯৪৮) আর অন্যটি লোকনাথ শর্মা পাউদালের 'মেরো রাম' (১৯৫৪)। সোমনাথ সিগদেল কেবলমাত্র বিশিষ্ট কবি ছিলেন তাই নয়, সংস্কৃত ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত।

পড়াশোনার সূত্রে কলকাতার সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। এখান থেকেই সংস্কৃত ‘কাব্যতীর্থ’ উপাধি তিনি লাভ করেন। সিগদেল মশাইয়ের রামায়ণ মুখ্যত বাল্মীকির ‘আদি রামায়ণ’ অনুসারে লেখা। এর বিশেষত্ব হলো, এখানে কোনো ‘কাণ্ড’ বিভাগ নেই। সম্পূর্ণ রামায়ণটি ১৬টি সর্গে বিভক্ত। এই রচনায় প্রায় ২০-২২টি ভিন্ন ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। লোকনাথ শর্মার ‘মেরো রাম’ অর্থাৎ আমার রাম বিরচিত হয়েছে অধ্যাত্ম রামায়ণের ভিত্তিতে। মূল কথাগুলিকে গদ্যছন্দে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন লেকনাথজী। এজন্য তাঁর রামায়ণ ‘মেরো রাম’-এর অপর নাম ‘রামায়ণ সার’। এখানে অবশ্য সাত কাণ্ডেই রামায়ণ তিনি লিখেছেন। কিন্তু ভানুভক্তের রামায়ণে যেখানে সহস্রাধিক শ্লোক রয়েছে, ‘মেরো রাম’-এ শ্লোক সংখ্যা ২৭৫টি।

এই সমস্ত রামায়ণ ছাড়া আরও কয়েকটি রামায়ণ মৌলিক ভাবে রচিত, অনুসৃত এবং অনুদিত হয়েছে নেপালিভাষায়। এর মধ্যে পণ্ডিত রামকান্ত বড়ালের ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত ‘অদ্ভুত রামায়ণ’-এর কথা প্রথমেই বলতে হয়। নেপালিতে তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন পণ্ডিত কুলচন্দ্র গৌতম (১৮৭৫-১৯৩৮)। তুলসীদাসের রামায়ণের অনুসরণে আরেকটি নেপালি রামায়ণ হলো পণ্ডিত রেওতিরাম নিওপানিয়ার (১৮৭৬-১৯৪৩) ‘অগ্নিবেশ রামায়ণ’। পণ্ডিত কালিদাস পরাজুলি (১৮৮১-১৯৫০) ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’ নেপালিতে অনুবাদ করেন। আবার, ১৯০১ সালে পণ্ডিত ভোজরাজ শর্মা লেখেন ‘আনন্দ রামায়ণ’। এখানে মাতা পৃথিবী সীতাকে আপন অঙ্গে স্থান দেবার পর, শ্রীরামের ভয়ে আবার তাঁকে ফিরেয়ে দেন। অতঃপর কতকগুলি নতুন কাণ্ডে এই কাহিনি বিবৃত হয়েছে। যে সকল নতুন কাণ্ড এতে রয়েছে সেগুলি হলো বিবাহকাণ্ড, রাজ্যকাণ্ড, মনোহরকাণ্ড ও পুরাণকাণ্ড। ১৯৩৩ সালে খাদগা বাহাদুর শ্রেষ্ঠ (১৮৭২-১৯৪৫) ‘রাধেশ্যাম রামায়ণ’-এর একটি কাণ্ড (‘বালকাণ্ড’) প্রকাশ করেন। এই সম্পূর্ণ রামায়ণটি প্রকাশ পায় ১২ বছর পরে। পণ্ডিত তারানাথ শর্মা বাল্মীকির রামায়ণের অনুসরণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল কাহিনি বর্ণনা করেছেন ‘রামের বিলাপ’-এ। এর বাইরে পূর্ণপ্রসাদ শর্মার ‘বৈজ্ঞানিক রামায়ণ’ ও লক্ষ্মীপ্রসাদ দেওকোটার ‘সীতা হরণ’ রামায়ণ রচনার ধারায় সাম্প্রতিক সংযোজন।

নেপালে রামায়ণের প্রসঙ্গ সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর একটি দাবিকে কেন্দ্র করে। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে,তাঁর যুক্তি , সুদূর অযোধ্যার সঙ্গে মিথিলার (যা কিনা নেপালে) বিবাহ সম্ভব ছিল না। কেননা এত দূরে যাতায়াতের পথ এবং যানবাহন সে সময় থাকা সম্ভব নয়। রামায়ণ যারা খুঁটিয়ে পড়েছেন, তারা জানেন, এই কাহিনিতেই রাম-সীতার বিবাহের পূর্বেই আরও দূরবর্তী দুটি অঞ্চলের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ও যাতায়াতের উল্লেখ রয়েছে। অযোধ্যার নৃপতি দশরথের দ্বিতীয় মহীষী কৈকেয়ী ছিলেন কেকয়রাজ কন্যা। পুরাতত্ত্ববিদরা এই কেকয় রাজ্যের রাজধানীর স্থান চিহ্নিত করেছেন অধুনা লাহোরের সন্নিকটে। শুধু তাই নয়, বয়োপ্রাপ্ত হয়ে ভরত নিজে এই মাতুলগৃহে গমনাগমন করেছেন। ভরতের যাত্রাপথের পথরেখা যদি অনুসরণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই যোগাযোগ অসম্ভব ছিল না। পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষণেও অনুরূপ একটি পথের অস্তিত্বের কথা স্বীকৃত হয়েছে। পণ্ডিত সোমনাথ সিগদেল তাঁর ‘আদর্শ রামায়ণ’-এর কাহিনিকে প্রাচীন ভারতের এক আদর্শ দম্পতির উপাখ্যান বলেছেন— যাদের একজন নেপালের বাগমতী তীরের সীতা এবং পরজন ভারতের সরযূনদীর তীরে অযোধ্যার রাম।

পাদটীকা :

১. ‘রামাশ্বমেধ কাণ্ড’ নামের আরেকটি রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, যার লেখক সুব্ব হোমনাথ খাতিয়ারা (১৯৫৪-১৮২৭ঃ। এটিকে প্রথমে তিনি ভানুভক্তের রামায়ণের অষ্টম সর্গ হিসেবে প্রকাশ করেন।

২. এখানে উল্লেখ্য যে ভানুভক্তের আগে গুমানিপন্থ (১৭৯০-১৮৪৬) এবং পণ্ডিত রঘুনাথ ভট্ট (১৮১১-১৮৬১) রামায়ণ ভিত্তিক কাব্য-কবিতা লিখেছেন। রঘুনাথ ভট্টের রামায়ণ আসলে নেপালি ভাষায় ‘অধ্যাত্ম রামায়ণে’র সপ্তকাণ্ডের অনুবাদ। পণ্ডিত রঘুনাথের রামায়ণ অবশ্য ভানুভক্তের রামায়ণ প্রকাশিত হবার পর, ১৮৮৮ সালে প্রকাশ পেয়েছিল।

৩. সুন্দরানন্দের পদবি কেউ লিখছেন বাউড়া, কোথাও বা বানড়া অথবা বাঁড়া (Banrah)।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বীরভূমে শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

সালটা ছিল ১৯৪৮। ফেব্রুয়ারি মাস। গান্ধী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা চলছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপর সরকারের নির্দেশে পুলিশ নির্যাতন চালাচ্ছে। স্বয়ংসেবক কার্যকর্তাদের পরিচিত মানুষদের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হলে তারাও তখন বলতে শুরু করে দিয়েছে, 'আরে, তোরা তো গান্ধী মার্ডারের দল'। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে সঙ্ঘের গ্রহণযোগ্যতা কমতে শুরু করেছিল। কিছু কিছু সাধারণ স্বয়ংসেবকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল, তাহলে কি সঙ্ঘের পতন শুরু হয়ে গেল! কত নানা ধরনের সংগঠন, সংস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় আবার কিছুদিন পর ধ্বংসও হয়ে যায়, আমাদের সঙ্ঘও কি তাদের মতো একটা পতনশীল সংগঠন!

শেয়ার মার্কেটে যখন কোনো শেয়ারের সূচক নিম্নমুখী হয় তখন কেউ সামান্য লগ্নি পর্যন্ত করতে চায় না। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী, লক্ষ্যে অবিচল। বিএসসি পড়াশোনা শেষ করার পর নিজের সম্পূর্ণ জীবন সমর্পণ করেছিলেন দেশমাতৃকার কাজে। না ছিল থাকার জায়গা, না ছিল খাবার ব্যবস্থা। না চেনেন রাস্তাঘাট, না ছিল পূর্ব পরিচিত লোকজন। তিনি বেরিয়ে পড়লেন সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে। তাঁর শরীরে বইছিল দেশপ্রেমের রক্ত। তাঁর কাছে এই দেশে ছিল ঘর, মাথার উপরে আকাশ ছিল ছাদ আর সঙ্ঘকাজ ছিল প্রাণ— এই তিন সম্বল করে তিনি চলে এলেন বীরভূমের সিউড়ি।

তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে ডাক্তারজীর অন্তিম দীক্ষান্ত ভাষণের সাক্ষী কালিদাস বসু পড়াশোনার প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য সিউড়িতে এসেছিলেন। সালটা ১৯৪২। তিনিই প্রথম বীরভূমের সিউড়িতে সঙ্ঘের বীজ বপন করেন। তিন মাস পরে তিনি ফিরে যাবার পর সেই চারাগাছ শুকিয়ে যায়। এরপর সাত বছর পেরিয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৪৮ সালে নাগপুর থেকে মুরলীধর নায়ক আসেন। তিনি কিছুদিন ছিলেন সিউড়িতে। তার পরেই ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আমাদের শৈলেনদা প্রথম স্থায়ী প্রচারক হিসেবে সিউড়ি আসেন।

সেসময় নবদ্বীপের স্বয়ংসেবক শিবেন মোদক সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের বিএ পড়তেন। তিনি বারুইপাড়াতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তার কাছে গিয়েই শৈলেনদা উঠলেন। সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল সেসময়। থাকার ঘর নিলে খাবার পয়সা থাকতো না আর খাবারের চিন্তা করলে থাকার ঘরের ভাড়া মেটানো দুঃসাধ্য ছিল। তাই তিনি শিবেনদার কাছে থাকতেন আর একবেলা না খেয়ে একবেলা হোটেলে খেয়ে কাটাতেন। যদিও তিনি তার কর্মকৌশলের দ্বারা পরবর্তী সময়ে সিউড়ি শহরে বহু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে স্বয়ংসেবকদের বাড়িতেই তিনি বেশিরভাগ খাওয়াদাওয়া করতেন। সেসময় শহরে কেউ পরিচিত ছিল না। তাই সারাদিন তিনি হেঁটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন এবং বিকেলে মাঠে খেলতেন স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে। এভাবে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আবার সঙ্ঘের শাখা শুরু করলেন সিউড়িতে। আজকের সঙ্ঘের যে শাখার রূপ আমরা দেখছি তখন এমন ছিল না নিষেধাজ্ঞার ফলে তখন বিকেলে শুধু ব্যায়াম, শরীরচর্চা আর খেলাধুলা হতো। এভাবে সিউড়িতে তিনি প্রভাত শাখা ও সায়ং শাখা শুরু করেছিলেন। এদিকে পুলিশের ভয় ,যদি জানতে পারে যে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক ,তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জেলে ভরে দেবে। তাই তিনি ছদ্ম পরিচয়ে ঘুরে বেড়াতেন। নিজেকে ইন্সিওরেন্স এজেন্ট বলে পরিচয় দিতেন। পকেটে সবসময় রাখতেন একটি আই কার্ড ।

এরপর জুলাই মাসে সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। তখন তিনি একটি ছোটো ঘর ভাড়া নেন। সেই ঘরে শৈলেনদা থাকাকালীন একবার প্রাদেশিক প্রচারক মনোহর হরকরেজী এসেছিলেন। তিনি সিউড়িতে কলেজ ছাত্র-যুবকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। পরদিন সকালে তিনি নিত্য অভ্যাস মতো 'দাসবোধ' পাঠ করতে গিয়ে বইটি আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ফলে তিনি 'দাসবোধ' পাঠ না করে খাবেন না এরকম প্রতিজ্ঞা করেন। প্রায় দুদিন পরে 'দাসবোধ' পাওয়া যায়। দুদিন উপবাসের পর তিনি অন্ন গ্রহণ করেছিলেন। নিত্য সিদ্ধ সাধনার এই ঘটনা যুবকদের মনে বিশেষ করে শৈলেনদার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে যা বীরভূমের সঙ্ঘ কাজে গতি আনে।

একদিন সিউড়িতে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শৈলেনদার পরিচয় হলো মল্লারপুরের শান্তিদার (বিশ্বনাথ মণ্ডল, বর্তমান প্রচারক অনুপ মণ্ডলের স্বর্গীয় পিতা) সঙ্গে। এরপরে মল্লারপুরে শৈলেনদার যাতায়াত শুরু হয়ে তাঁর বাড়িতে। বীরভূমে সিউড়ির বাইরে প্রথম মল্লারপুরেই শাখা শুরু হয়। শুধু সঙ্ঘের কাজেই নয়, স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর। তার ব্যবহার এতই আন্তরিক ছিল যার জন্য তিনি স্বয়ংসেবকদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে সঙ্ঘকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন শান্তিদা। (শৈলেনদা ফিরে

যাবার পরের ঘটনা) শান্তিদার দুই ছেলে। বড়ো ছেলের প্রচারক বেরোনোর কথা। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! বড়ো ছেলের পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। সেদিন শ্মশানে দাঁড়িয়ে শান্তিদা বলেছিলেন, 'চিন্তা করো না, বড়ো ছেলেকে দিতে পারলাম না তো কী হয়েছে আমার ছোটো ছেলে আছে, ও দেশের সেবা করবে'। তাঁর সেই ছোটো ছেলে অনুপদা এখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক

সেসময় এক ঘটনা ঘটল। একদিন শৈলেনদা ও প্রথম জেলা সঙ্ঘচালক তারাশঙ্করদা দুজন প্রভাত শাখায় যাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ রাস্তায় পুলিশ তাদের আটকায় ও বলে যে আমরা পাশের একটা বাড়ি সার্চ করব আপনাদের সাক্ষী হতে হবে। মুসলিম লিগের সদস্যের বাড়ি ছিল সেটা। সেই মুসলমান বাড়িতে সার্চ করার পর একটি তাজা বোমা ও পিস্তল উদ্ধার করেছিল পুলিশ আর তাতে সাক্ষী হয়ে থাকলেন শৈলেনদা। শৈলেনদা সাক্ষ্য হয়ে সই করলেন ও নীচে লিখলেন সঙ্ঘের প্রচারক। এর ফলে তার পরিচয় জেনে যাওয়ার পর বাড়ির মালিকের উপরে বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসতে থাকে। তখন কংগ্রেসি লোকেরা বাড়ির মালিককে ভয় দেখায়, কেন গান্ধী হত্যাকারী দলের লোককে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছো? কেন তাকে খেতে দিচ্ছ ইত্যাদি। ফলে শৈলেনদাকে সেই বাড়ি ছাড়তে হয়। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি এক অস্বাস্থ্যকর চায়ের দোকানের একটি ঘর খুঁজে পেয়ে সেখানেই অল্প মূল্য দিয়ে থাকতে বাধ্য হন। সারা ঘরে আরশোলা , বর্ষায় ঘরে জল, শীতে ঠাণ্ডা হাওয়া — এরকম কষ্ট তার মনকে ক্লান্ত করতে পারেনি। শয়নে স্বপনে একটাই চিন্তা সঙ্ঘ কাজ, সঙ্ঘ কাজ বৃদ্ধি, সঙ্ঘ কাজের বিস্তার।

সিউড়িতে সেসময় হিন্দু মহাসভার কিছু উকিলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে রামপুরহাটের উকিল হেমবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এভাবে ধীরে ধীরে রামপুরহাটে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে রামপুরহাটের গোপীমোহন বিশ্বাস বিস্তারক হয়ে আসেন। গোপীদা ও শৈলেনদার নেতৃত্বে রামপুরহাটে কাজ বাড়তে থাকে। পরবর্তী সময়ে গোপীদা রামপুরহাটেই এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে যোগদান করেন এবং সারাজীবন এখানেই কাটিয়ে দেন।

একদিন শৈলেনদা খবর পেলেন কলকাতার বড়বাজারের এক স্বয়ংসেবকের আত্মীয় গৌরীশংকর ঝুনঝুনওয়ালা সাঁইথিয়াতে থাকেন। খবর পেয়েই তিনি সাঁইথিয়া পৌঁছে গেলেন। পরিচয় করলেন গৌরীদার সঙ্গে। কথা বললেন সঙ্ঘের আদর্শ, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। এভাবে কয়েকবার যাতায়াতের মাধ্যমে তিনি সাঁইথিয়াতে সঙ্ঘ কাজের পরিবেশ তৈরি করলেন। পরবর্তীকালে সাঁইথিয়ার প্রথম বিস্তারক বীরেন্দ্রদা (পুরো নাম পাওয়া যায়নি) আসার পর তীব্রগতিতে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বীরভূমের যেখানেই সম্পর্কসূত্র পেয়েছেন সেখানেই পৌঁছে দিয়েছেন সঙ্ঘকে। নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর থেকে সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে সঙ্ঘের পক্ষে প্রচারকদের ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। ফলে সঙ্ঘ বিকল্প পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। তাই সে সময় ক্ষেত্রীয় প্রচারক একনাথ রানাডে অবস্থা বিবেচনা করে বলেছিলেন, যারা বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছুক তারা ফিরে যেতে পারেন। বাড়ি ফিরে তাঁরা স্থানীয়ভাবে সঙ্ঘের কাজ করুন। তার কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝতে পেরে শৈলেনদা ১৯৫২ সালে বীরভূমে সঙ্ঘকাজের ভিত মজবুত করে দিয়ে বাড়ি ফিরে যান। বাড়ি ফিরে আজীবন গৃহী কার্যকর্তা হয়ে কাজ করে গেছেন। তিনি একসময় পশ্চিমবঙ্গের সহপ্রান্ত কার্যবাহ হয়েছিলেন।

তিনি বীরভূমের নাম শুনলেই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। এই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম দু'বছর আগে। আমি বীরভূম থেকে এসেছি শুনেই তার চোখদুটি জলে ভরে উঠেছিল। বীরভুম যে তার হৃদয়ে কতটা স্থান অধিকার করেছিল সেকথা সেদিন বুঝেছিলাম। গত ২২ জুলাই বীরভূমের সঙ্ঘকাজের এই প্রাণপুরুষকে আমরা চিরদিনের মতো হারিয়েছি। তাঁকে আমার শতকোটি প্রণাম।

(প্রতিবেদক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ বীরভুম জেলার সহ শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ)

With Best Compliments From

A Well Wisher

With Best Compliments from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

With Best Compliments From :

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN ISO 9001 : ISO 14001 : OHSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

International Quality Packaging Board

Coated Grey Back Board, Folding Box Board and SBS Board (White)

High Quality White and Pink Newsprint

S. S. Maplitho, Writing & Printing and Ledger Paper.

* * *

Registered Office :

1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, ACROPOLIS, Unit No. -1
15th Floor, Kolkata - 700 107, (West Bengal)
Phone : 6627-1300/1301, Fax : (033) 6627-1338
E-mail : emamipaper@emamipaper.com
Website : www.emamipaper.in

FOR BUSINESS ENQUIRY - CONTACT :
Mr. Soumyajit Mukherjee, Vice President (Marketing and Sales),
Mob. +91 9051575554, E-mail : soumyajit@emamipaper.com

Unit Gulmohar
R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata - 700 035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/ 65409610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.com

Unit Balasore
Vill. - Balgopalpur
P. O. Rasulpur,
Dist. - Balasore (Odisha) - 756 020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.com

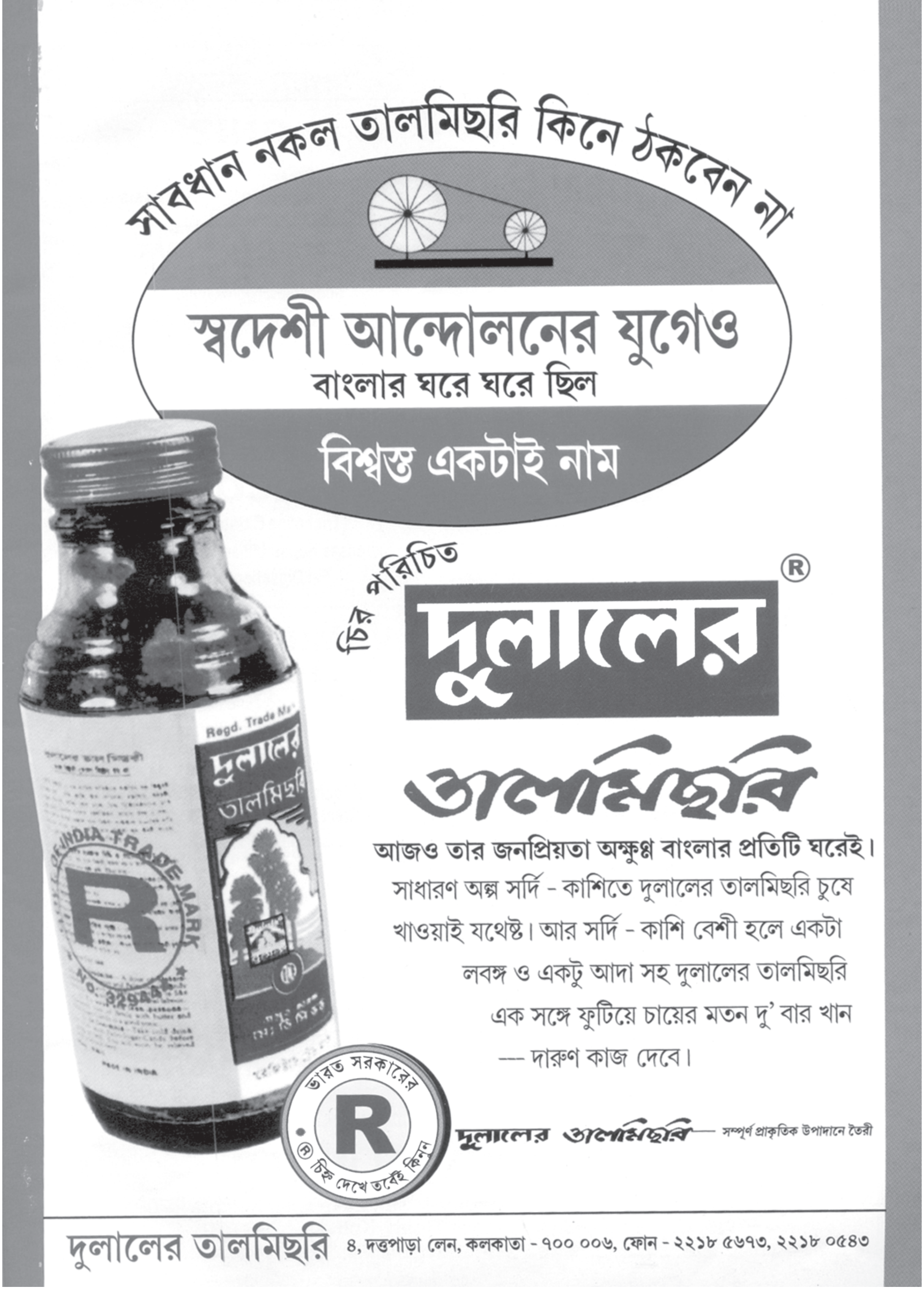

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

SURYA
Energising Lifestyles
Innovative
DESIGN
World-Class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA
lighting
fans
appliances
pipes
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

(৫১)

CHOOSE THE BEST

DURO™

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

TRIPLE HEAT TREATED

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | P: (033) 2265 2274 | Toll Free: 1800 345 3876 (DURO)

Email: corp@duroply.com | Website: www.duroply.in | Find us on duroplyindia